চতুর্থ অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের শিল্পরীতি

''ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর-একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে আর-একজনের তেমন হইবে না। সেই জন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য, রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।''[১]

পৃথিবীর যে কোনও শিল্পই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তার শিল্পরীতির মধ্য দিয়েই। একমাত্র শিল্পরীতিতেই লেখকের প্রতিভা, কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। কারণ ভাব ও বিষয় স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ কিন্তু রীতিকেই আমরা একমাত্র বলতে পারি ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভরশীল। আর শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভাব ও বিষয় দ্বারা রীতিকে আচ্ছন্ন করে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠককে আনন্দ দান করা। একজন প্রথম শ্রেণির রাঁধুনির কৃতিত্ব রান্না করার বিষয়বস্তুতে নাই। তিনি যেভাবে বিভিন্ন কাঁচামালের সহযোগে রান্নাটি তৈরি করলেন— সেই পদ্ধতিতেই রাঁধুনির কৃতিত্ব প্রকাশিত হয় এবং অন্য রাঁধুনি থেকে তার স্বতন্ত্রতা, অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে লেখক বা শিল্পী সম্পর্কে একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মূল্যায়নে তাই শিল্পরীতির আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর আমরা তো জানি, শিল্পের ইতিহাস আসলে তো শিল্পরীতির ইতিহাস। বিষয়বস্তু, জীবন দৃষ্টি, সময়-সমাজ-ঐতিহ্য ইত্যাদি যে পদ্ধতিতে লেখক একটা শিল্প সংরূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তাতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলা কথাসাহিত্যে একজন প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে শিল্পরীতির কয়েকটি দিক থেকে লেখকের কিছু উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে লেখকের শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করব। তিনি যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে উপন্যাস নামক শিল্প সংরূপটি নির্মাণ করেছেন— তার গোপন স্বভাবটি পাঠকদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করব। সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে দেখব— কীভাবে তা পাঠকের মনের মধ্যে রস সঞ্চার করে আনন্দ দান করতে সমর্থ হয়েছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস মূলত চরিত্রপ্রধান। তাই চরিত্রই উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত

বা পরিচালিত করেছে— এই চরিত্রের মাধ্যমেই কাহিনিবৃত্ত বা প্লট গড়ে উঠেছে। আরও বিশ্লেষিত করলে বলা যায় চরিত্রের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা-চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কাহিনিবৃত্ত নির্মিত হয়েছে। আর অধিকাংশ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র লেখকের 'অল্টার ইগো' (Alter Ego) বলতে পারি। ঘাম দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার যথেচ্ছ ব্যবহার—এর একটি অন্যতম কারণ। কল্পনার চেয়ে নিজের জীবনাভিজ্ঞতাকেই অনেক বেশি আঁকড়ে ধরেছেন তিনি। অবশ্য ঔপন্যাসিক মাত্রেই তা করেন কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেন শুধু লেখার জন্য অভিজ্ঞতা সংগ্রহের অভিযানে নেমেছেন। সাহিত্য মাত্রেই কল্পনা থাকবে— কিন্তু কল্পনার প্রয়োগ লেখক-বিশেষে নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে শ্যামলের কল্পনার প্রয়োগ যেন কোনও লেখাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করার জন্যে যে ন্যূনতম পরিমাণ দরকার হয়, ততটুকুই। এই প্রসঙ্গে লেখক জানান, ''সন্দীপন বলেছিলেন, তুই একদম বানাতে জানিস না। তোর কোন ইমাজিনেশন নেই!

একথারও কোন জবাব দিতে পারিনি। কারণ দিয়ে কোন লাভ নেই। কোথায় বানাই— কোথায় আসলের সঙ্গে মিশেল দিই, তা বাইরের লোক কি করে বুঝবে! সৃষ্টিতে আমি দ্বিতীয় ব্রহ্মা—এমন কোন গর্ব আমার নেই।"[২] এজন্যই হয়তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসের প্লট যৌগিক। সেই সব উপন্যাসে লেখকের 'অল্টার ইগো' বা কেন্দ্রীয় কোনও ভাব আপাতবিচ্ছিন্ন কাহিনিগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। আসলে লেখকের ঔপন্যাসিক-চরিত্রসত্তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করে যে অন্যান্য কাহিনিগুলো সর্বদা উপন্যাস তৈরির ক্ষেত্রে অনিবার্য আবশ্যিক হয়ে উঠতে পারে না। আবার উক্ত কাহিনিগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র উপন্যাস নির্মাণ করা যেতে পারে— লেখক কখনও কখনও তা করেছেনও। তাই যৌগিক প্লটের উপন্যাস লেখকের রচনাবলীতে বেশি পরিমাণে দেখা যায়। অবশ্য সরল ও জটিল প্লটও লেখকের উপন্যাসে দেখা যায়— যা ক্রমশ আলোচ্য। আমরা এই অধ্যায়ে শিল্পরীতির আলোচনা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। যথা— ক. গঠননৈপুণ্য, খ. উপস্থাপনা রীতি ও গ. ভাষাবিন্যাস।

ক. গঠননৈপুণ্য:

আমরা নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে গঠনরীতি, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' (পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত নাম) উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস কৌশল আলোচনা করা যাক। মোট ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাস। মূলত চারটি কাহিনিকে আশ্রয় করে এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে— ১. প্রমথ-সুধা ও তার

পরিবার, ২. অবিনাশ-লিলি-নীলিমা-প্রমথ, ৩. প্রমথ-বীথি-নীতিশ ৪. প্রমথ ও তার পরিবার। প্রতিটি কাহিনির মধ্যে যোগসূত্র রক্ষিত হয়েছে প্রমথের মধ্য দিয়ে। প্রমথের এক ধরনের অনুভব কাহিনিগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংগতি দান করেছে। সেই অনুভব হলো, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও স্ব-নির্মিত কৃত্রিমতার মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র আকুলতা। মানুষ যখন ছদ্মবেশে ধুঁকতে থাকে, নিজের বিবেক দ্বারা দংশিত হতে হতে নিজেরই গায়ের রঙ নীল হয়ে যায়— তখন মানুষের ভেতর থেকেই সজ্ঞানে- অজ্ঞানে প্রতিরোধ শুরু হয়। আলোচ্য উপন্যাসের বিভিন্ন কাহিনিগুলোতে বিভিন্ন মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে থেকে প্রমথ যেন সেই চেষ্টাই করে যায়। তাই কাহিনির ঐক্যের নিরিখে এই উপন্যাস যৌগিক প্লটের উদাহরণ।

অন্যদিকে, বৃত্তাকার ও রৈখিক প্লটের ধারণা গুণময় মান্না তার 'বাংলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক' গ্রন্থে সুন্দরভাবে দিয়েছেন, ''যে সমস্যা দিয়ে কোনো জীবনের শুরু, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান হলে বৃত্তাকার প্লট হয়, যদিও পরিধির অপর মুখ ফিরে এসে একই জায়গায় মেলে না, রূপ নেয় স্পাইর‍্যালের। পক্ষান্তরে, রৈখিক প্লটে ঘটনার পর ঘটনা যুক্ত হয়ে একটা শৃঙ্খল রচনা করে, যার দুই মুখ খোলা থাকে, ধরে নেওয়া হয়, যে ঘটনা দিয়ে শুরু হল তার আগেও অনুরূপ ঘটনার সম্ভাবনা।''[৩] উপরিউক্ত সংজ্ঞার নিরিখে 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসটিকে আমরা বৃত্তাকার প্লট বলতে পারি। কারণ ''বৃত্তাকার প্লটের অন্তিমে উপলব্ধির স্তর একটু উঁচুতে ওঠে (Spiral development), মানুষটাও বদলে যায়।''[৪] প্রমথের যাত্রা শুরু হয় ছদ্মবেশে ধুঁকতে থাকা সমস্যা নিয়ে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখি প্রমথের অনুভবের গুণগত পরিবর্তন। যে প্রত্যয় নিয়ে প্রমথ তার ছালচামড়ার উপর ধুলো দিয়ে চিত্রবিচিত্র পোশাক তৈরি করেছিল, উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখি সেই প্রত্যয়কে ভেঙে ফেলার আকুল প্রচেষ্টা। ফলে আমরা বলতেই পারি উপন্যাসের অন্তিমে প্রমথর উপলব্ধির স্তর একটু উঁচুতে উঠে বৃত্তাকার প্লটের সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়টি একটি লেখচিত্রের সাহায্যে দেখা যাক—

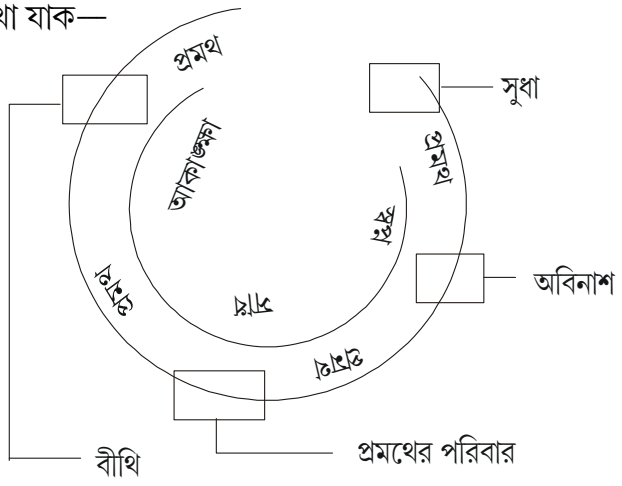

কাহিনিকাল ও কথনকাল নিয়ে কোনও উপন্যাসের বাচনকাল নির্মিত হয়। আমরা জানি কাহিনিকাল পরিচালিত হয় 'প্রকৃত' সময়ের অনুসারেই। অর্থাৎ কাহিনিকাল হল: ক-খ-গ-ঘ-ঙ। কিন্তু উপন্যাসের বাচনকাল 'প্রকৃত' সময়ের অনুক্রমে নিয়ন্ত্রিত হয় না। যে কোনও প্রথম শ্রেণির লেখক বাচনকাল সাজায় ঘটনার পুনর্বিন্যস্ত বা বিপর্যস্ত ক্রমে। কারণ বহমান সময়ের হুবহু নকল (অর্থাৎ পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনার পরপর বর্ণনা) লেখকের শিল্প-কল্পনার অভাব প্রদর্শন করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে 'প্রকৃত' সময়ের অনুক্রমে যদি ঘটনাগুলো সাজানো যায় তা হবে অনেকটা এই রকম—

ক. প্রমথের ম্যাট্রিকে পড়ার সময় তনুদার মৃত্যু।

খ. লেখালেখির সূত্রে অবিনাশ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

গ. গ্র্যাজুয়েট হবার জন্য প্রমথের কলেজে ভর্তি হওয়া। সেখানেই সুধা ও তার দিদি রেখার সঙ্গে পরিচয়। সুধার সঙ্গে প্রমথর ভালোলাগার প্রেম পর্ব শুরু।

ঘ. গ্র্যাজুয়েট হবার পর প্রমথর পুনরায় চাকরির চেষ্টা।

ঙ. প্রমথের কাছে সুধার ধীরে ধীরে বাসি হয়ে যাওয়া— তারপরেও প্রমথর সেই সম্পর্কের বোঝা টানা।

চ. নীলিমার সঙ্গে অবিনাশের পরিচয় ও নীলিমার প্রেমে পরা বা ভালোলাগার টান তৈরি হওয়া বিবাহিত অবিনাশের।

ছ. নীলিমার প্রতি আকর্ষণে অবিনাশের হাবুডুবু খাওয়া।

জ. প্রমথর নীতিশের সঙ্গে নীতিশের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ও বীথিকে প্রথম দেখা।

ঝ. বীথির প্রতি প্রমথের দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়া।

ঞ. অবিনাশ চৌধুরীর অফিসে প্রমথের চাকরি হয়ে যাওয়া।

ট. বীথির সঙ্গে প্রমথর বিবাহ ও তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু হওয়া।

এই ঘটনাক্রমকে লেখক তাঁর উপন্যাসে কীভাবে পুনর্বিন্যস্ত বা বিপর্যস্ত ক্রমে সাজিয়েছেন, তার লেখচিত্র তুলে ধরা হলো—

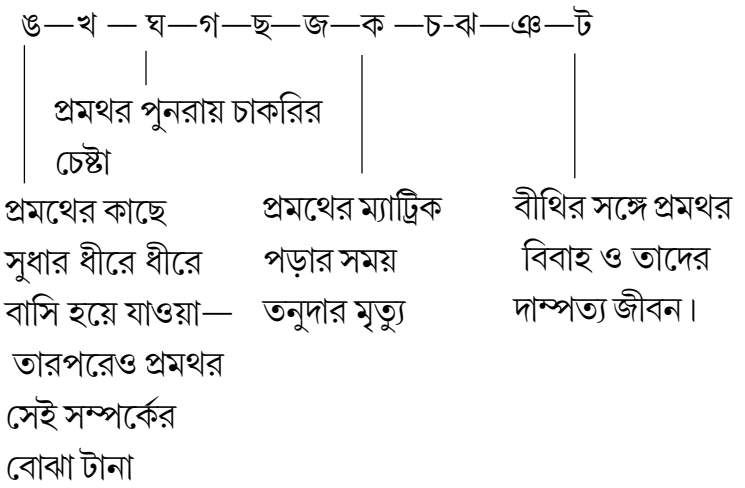

লেখক এভাবেই বাচনকালে ঘটনাকে পুনর্বিন্যস্ত বা বিপর্যস্ত ক্রমে সাজিয়েছেন, কখনও কখনও ঘটিয়েছেন পূর্ব-উদ্‌ভাস বা পশ্চাৎ-উদ্‌ভাস। ''আখ্যানকালের সীমা বা পরিসর বদ্ধ অথবা মুক্ত, উভয়ই হতে পারে।''[৫] আমরা যদি 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' কাহিনির দিকে তাকাই, তাহলে এই আখ্যান কালের সীমাকে বদ্ধ পরিসর বলতে পারি। প্রথমে নামকরণের দিক থেকে দেখা যাক। পৌরাণিক সূত্রে অজ্ঞাতবাস হোক বা বৃহন্নলা (পূর্বনাম)— উভয়ই একটি নির্দিষ্ট সীমিত সময়কেই ইঙ্গিত করে। উপন্যাসের ভাবগত দিকটিও বদ্ধ পরিসরের দিকে ইঙ্গিত করে। ছদ্মবেশের সৃষ্টি— ছদ্মবেশে সাময়িক মজা পাওয়া— ধীরে ধীরে ছদ্মবেশের ভেতর ধুঁকতে থাকা— ছদ্মবেশ খুলে ফেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা— বেরিয়ে আসার আকুল প্রচেষ্টা— ভেতর ও বাহির, উভয় প্রকার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পোষাকটার আকর্ষণ তুচ্ছ করে সত্যের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ান। এবার 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের বাচনক্রম দেখা যাক—

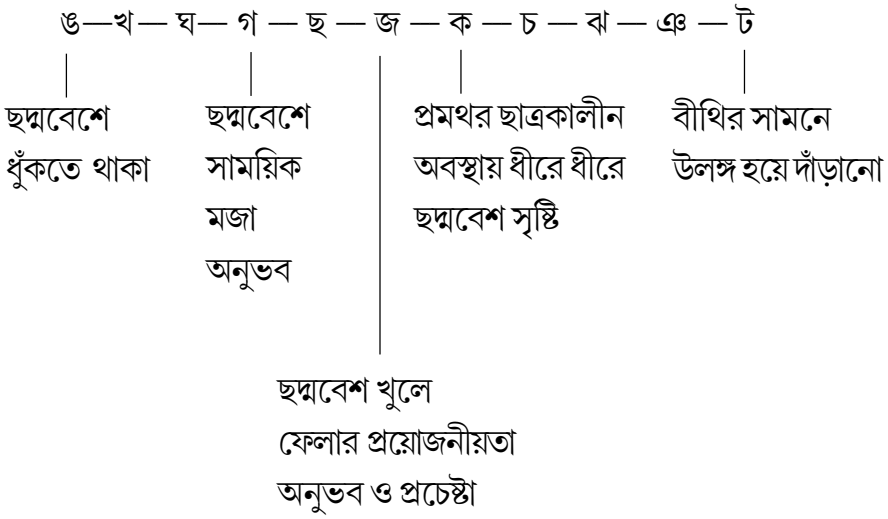

আখ্যানকালের মুক্ত পরিসরের পক্ষে যুক্তি এমন হতে পারে যে, এই পৃথিবীতে কোনও রক্ত-মাংসের মানুষ পুরোপুরি সৎ হতে পারে না। সে শুধু আমৃত্যু সৎ হবার চেষ্টা বা প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে। ফলে উপন্যাসের কাহিনি যেখানে শেষ হচ্ছে, তা আসলে প্রমথর সত্যের সামনে নিজেকে উলঙ্গ করে দাঁড়ানোর সূত্রপাত মাত্র— যা অন্য একটি আখ্যান-সম্ভাবনা লালিত করছে। এই সূত্রে এই আখ্যান মুক্ত পরিসরের। কিন্তু আমরা বলতে চেয়েছি প্রমথ যেভাবে তার স্ত্রী বীথির সামনে নিজেকে নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে— তা আগে কখনও করতে পারেনি। তাছাড়া নিজেকে সৎ করার বক্তব্যটি এই উপন্যাসের বাচনে পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এক ধরনের ক্রিয়াগত ঐক্য (Unity of Action) এই উপন্যাসের বাচনে দেখতে পাই। তাই আমরা একে বদ্ধ পরিসরের বাচন হিসাবেই ধরব। আর 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের প্রতিটি কাহিনির মধ্যে প্রমথ চরিত্রের পৌনঃপুনিকতা ও পাঠগত আধিপত্য তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে মর্যাদা দেয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তী উপন্যাস 'অনিলের পুতুল' সরল প্লটের আখ্যান। অনিল ও তার পরিবারের কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাস নির্মিত হয়েছে। 'মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ'[৬] এই সব প্রসঙ্গ নিয়েই একটি সরল প্লট নির্মিত হয়েছে। লেখক সাধারণত কাহিনি-বিন্যাস কৌশলে কাহিনিগত ভূমিকা ব্যবহার করেন না। সরাসরি কাহিনিতে প্রবেশ করা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— এই উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। কাহিনি-বিন্যাসে প্রথম থেকেই তিনি প্রসঙ্গগুলো সাজিয়ে দিয়েছেন এভাবে—

মৃত্যু— মৃত্যুপথযাত্রী তরঙ্গিণীর প্রসঙ্গ দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত— পরবর্তীতে মৃত্যু।

দম্ভ— তরঙ্গিণীর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ অব্যবহিত পর্বে তরঙ্গিণীর পিতার সূত্রে তরঙ্গিণী ও তার সব বোনেদের লালিত দম্ভের প্রসঙ্গ।

শোক—তরঙ্গিণীর মৃত্যু এবং অন্যান্য মৃত্যু-প্রসঙ্গ।

অসুখ—তরঙ্গিণীর অসুস্থতা থেকে পুতুলের অসুখ। মাঝে অনিলের ডিজিস-ফোবিয়া।

ওষুধ— কাহিনি জুড়ে ওষুধের বিস্তৃত বর্ণনা।

এই বিন্যাসক্রম পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ নিয়ে একটি বিশেষ প্যাটার্ণ তৈরি করে। যা অনিলের সংকট, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, ফোবিয়া, উত্তরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ-এর এক একটি সিঁড়ি নির্মিত হতে দেখি। ফলে অনিলের গতিশীলতা, মনস্তত্ত্ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপরে উল্লিখিত প্রতিটি প্রসঙ্গ এতবার পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয়

যে— লেখক যেন এই প্রসঙ্গগুলোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন অনিল ও পাঠকের চিন্তা-ভাবনাকে। প্রতিটি প্রসঙ্গকেই অনিল যেন পোস্টমর্টেম করেছে এবং শেষপর্যন্ত ওই সব প্রসঙ্গ থেকেই আবিষ্কার করেছে উত্তরণের সিঁড়ি। সরল প্লট রচনা ও প্রসঙ্গগুলোর পৌনঃপুনিক ব্যবহার এক্ষেত্রে কার্যকরী কৌশল হিসাবে দেখা গিয়েছে।

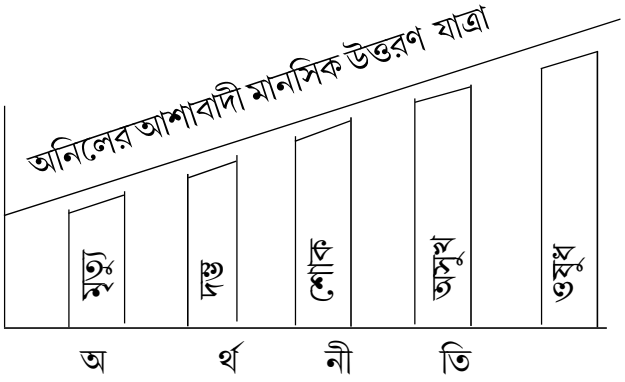

সমস্যা, প্রতিকূলতা স্বীকার করে অনিলের জীবনবাদী আশাবাদী মানসিকতা

মৃত্যু, দম্ভ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো সর্বদা এক এক করে এসেছে, তা হয়তো নয়। অনেক সময় মিলেমিশে এসেছে বা কাহিনি জুড়ে থেকেছে— কিন্তু অনিলের মানসিক উত্তরণ যাত্রা সমস্যা বা প্রতিকূলতাকে সামনে থেকে লড়াই করার ইচ্ছাশক্তির ফলেই ঘটেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় বিখ্যাত একটি উপন্যাস হলো, 'কুবেরের বিষয় আশয়'। এই উপন্যাসেও আমরা যৌগিক প্লটের দেখা পাই। যে কাহিনিগুলো নিয়ে এই উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে, তার কেন্দ্রীয় ভূমিকাগুলো নির্বাহ করেছে—

১. কুবের

২. ব্রজ ফকির

৩. বুলু

এই তিনটি চরিত্রের জীবন দু'টি অংশ বা পর্বে বিভক্ত হয়ে মোট ছ'টি পর্বের (অলিখিত) সমষ্টি করে উপন্যাসের আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে। তাহলে কাহিনি-বিন্যাসের চিত্রটি হবে এই রকম—

কুবের

১ ক পারিবারিক গতানুগতিক জীবন। সামান্য জমি কিনে সবাইকে নিয়ে একটু খোলামেলা থাকার ইচ্ছা। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী বুলু, সন্তান, বাবা, মা, দাদা-ভাই ও তাদের স্ত্রী। শেষপর্যন্ত কদমপুরে জমি কেনা।

পর্ব ১খ

জমির নেশায় মাতোয়ারা ড্রিম মার্চেন্ট কুবের।

পারিবারিক সম্পর্কগুলো শিথিল ও ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া। ড্রিম সেলার কুবের।

২ ক চকদার হবার আকাঙ্ক্ষায় মেদনমল্লের দ্বীপে বিনিয়োগ। ইতিহাসের বিস্তৃত কালপ্রবাহে সেনাপতি মদনমল্লের দুঃসাহসিকতা, অনিশ্চয়তা কুবেরের অনুভব করা। মা-এর মৃত্যু। ব্রজ ফকিরের স্ত্রী আভার সঙ্গে দ্বীপের মধ্যে সংসার— আভাকে খুন করা।

২ খ সর্বস্ব খুইয়ে পুনরায় কদমপুরে ফিরে আসা।

ব্রজ ফকির

পর্ব ১ ভবঘুরে অস্থির জীবন। নানান ছল-চাতুরির সাহায্যে অর্থ উপার্জন ও জীবন নির্বাহ। অর্থ উপার্জনের কৌশল বদলানোর মত স্ত্রী বদলানো। কোনও কিছুতেই থিতু হতে না পারা।

পর্ব ২ ব্রজ দ্বারা রেলেশ্বর শিবের পাথর আবিষ্কার ও রেলেশ্বর শিব নাম দিয়ে স্থাপনা। আর্থিক উপার্জনের নিশ্চয়তা আনবার জন্য মন্দির নির্মাণ ও মোহন্ত হিসাবে নিজেকে ঘোষণা। এই একটি বিষয়েই সমস্ত মনোযোগ ও থিতু হওয়া।

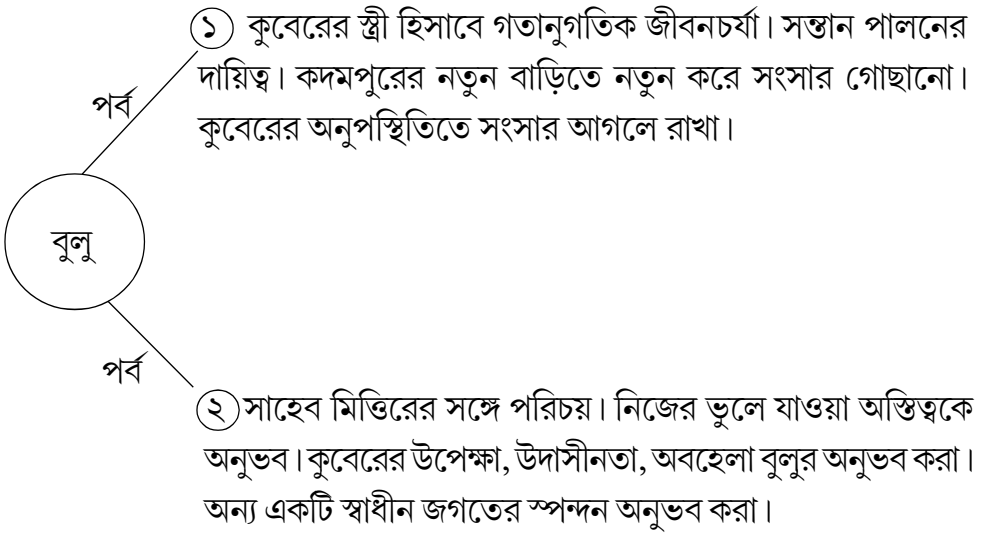

কুবেরর জীবনের প্রথম পর্ব প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য আমরা প্রথম পর্বের দু'টি উপবিভাগ করেছি। পর্ব একের ক প্রথম থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এবং পর্ব একের খ অষ্টম থেকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। কুবেরের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বটিকেও দু'ভাগে বিভক্ত করলে, পর্ব দু'য়ের ক পঞ্চদশ থেকে আঠাশতম পরিচ্ছেদ এবং পর্ব দু'য়ের খ ঊনত্রিশতম পরিচ্ছেদ থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত। অবশ্য প্রথম পর্বে চতুর্থ পরিচ্ছেদ এবং দ্বিতীয় পর্বে কুড়ি, বাইশ, তেইশ ও ছাব্বিশ পরিচ্ছেদে কুবেরের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় না। এরপর আমরা ব্রজ ফকিরের কাহিনির যদি পর্ব বিভাগ করতে হয়, তাহলে এখানেও দু'টি পর্ব স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত (এর মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, নবম, একাদশ পরিচ্ছেদে পাঠগত আধিপত্য লক্ষণীয়) এবং দ্বিতীয় পর্ব চতুর্দশ থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদে পর্যন্ত বিস্তৃত (এর মধ্যে চোদ্দ, কুড়ি, একুশ, বাইশ, তেইশ, ছাব্বিশ, একত্রিশ পরিচ্ছেদে ব্রজ ফকিরের পাঠগত আধিপত্য রয়েছে)। এরপর আসা যাক, বুলুর কাহিনিতে যেখানে প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত (যার মধ্যে দুই, ছয়, আট, নয়, দশ, বারো, ষোলো, সতেরো নম্বর পরিচ্ছেদগুলোতে বুলুর পাঠগত আধিপত্য লক্ষণীয়) এবং দ্বিতীয় পর্ব কুড়ি থেকে একত্রিশতম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিন্যস্ত (যার মধ্যে কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ পরিচ্ছেদগুলোতে পাঠগত আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়)। উপরিউক্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণের যদি নির্যাস বের করা যায়, তাহলে সেটা হবে—

চরিত্র	পাঠগত উপস্থিতি
ক) কুবের	২৬ টি পরিচ্ছেদ
খ) বুলু	১৫ টি পরিচ্ছেদ
গ) ব্রজ ফকির	১২ টি পরিচ্ছেদ

খুব সহজেই তাহলে বোঝা যাচ্ছে কুবের চরিত্র যাকে আমরা লেখকের 'অল্টার ইগো' (Alter Ego) হিসাবে চিহ্নিত করেছি, লেখকও সেই চরিত্রকেই কাহিনিতে অধিক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কুবেরই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বা ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ''আমার জীবনে এটা একটা স্যাড্ ঘটনা আভা—বলতে পার এক্সপিরিয়েন্স।''[৭]— এই বাক্যটি উপন্যাসের কাহিনিতে প্রায় ধ্রুবপদের মত ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি কাহিনির সূত্রপাতও হয়েছে এই বাক্যের প্রসঙ্গ সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে, ''বাঁ হাতখানা মেলে ধরলো কুবের। ...'' ছোটবেলায় ঘটা একটি ঘটনার স্মৃতি কুবেরের জীবনের (ভ্যাগাবন্ড- ড্রিম মার্চেন্ট- চকদার) প্রতিটি পর্যায়ে তাড়া করে বেড়ানো, এটাই প্রমাণ করে যে, মধ্যবিত্ত পরিবারে ছোটবেলায় তৈরি হওয়া সংস্কার-মূল্যবোধ কুবের কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই বুর্জোয়া সমাজে নিজেকে উন্নীত করলেও কখনও মানিয়ে নিতে পারেনি— ফলে একাকীত্ব, নির্বাসন কুবের চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই এসেছে। পুরানো সমাজের মূল্যবোধ যে কুবের কখনোই ত্যাগ করতে পারেনি— তা দেখানোর একটা কৌশল হিসাবেই যেন বাক্যটি ধ্রুবপদের মত ব্যবহৃত হয়েছে।

'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের প্লটকেও আমরা যৌগিক বলতে পারি। আর যৌগিক প্লটের উপন্যাসের গঠন কিছুটা শিথিল প্রকৃতির হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসে আত্মজৈবনিক উপাদান ব্যবহার করেছেন বলেই যৌগিক প্লটের উপন্যাসে বিভিন্ন কাহিনিগুলোর মধ্যে একটি কাহিনি পাঠগত আধিপত্য লাভ করে। আমরা 'কুবেরের বিষয় আশয়' এই উপন্যাসটিতে লক্ষ্য করেছি আবার 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসেও সেটা দেখতে পাই। এখানেও মূলত তিনটি কাহিনির তিনটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো— ক. অনাথবন্ধু বসু খ. বংশী চন্দ্র কাপালি এবং গ. সন্তোষ টাকি। কিন্তু অনাথবন্ধু বসুর কাহিনি এতটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, কখনও উপন্যাসটিকে জটিল প্লটের রচনা মনে হয়। এই উপন্যাসে দু'টি ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তার সামগ্রিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা লেখকের কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনটি কাহিনির বিন্যাস-কৌশল একটু দেখা যাক—

ক. অনাথবন্ধু বসু: শহরের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে গ্রামে অনেকটা জায়গা জুড়ে নিজের বাড়ি তৈরি করে স্ত্রী, সন্তান, পোষ্যদের নিয়ে 'বাবু' হিসাবে বসবাস করা। ডেইলি প্যাসেঞ্জার হিসাবে কলকাতায় চাকরি। নতুন কিছু তৈরি করে আনন্দ পাবার স্বপ্নে বুঁদ হয়ে ব্যাংক ঋণ নিয়ে সমবায়িক প্রথায় কৃষিকাজে নেমে পড়া। তৈরি করার আনন্দের লেজুড় হিসাবে আসতে থাকে একের পর এক বিপর্যয়, কিন্তু 'হেরে যেতেই হবে আগাম জেনেও দৌড় থামানোর উপায় নেই।' দম ফুরিয়ে আসছিল বলেই যেন খানিক বিশ্রাম নেবার প্রয়োজনে সাময়িকভাবে থামতে হলো— পুনরায় কলকাতার ভাড়াবাড়িতে গিয়ে ওঠা। দম নেবার বিনিময়ে ঈশ্বরীতলার সমস্ত সম্পত্তি (বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট পোষ্য-সহ) বংশী কাপালির কাছে বিক্রি করে দিতে হয়— ঈশ্বরীতলা থেকে নিয়ে যেতে পারে শুধু পৃথিবীকে দেখবার কৌশল।

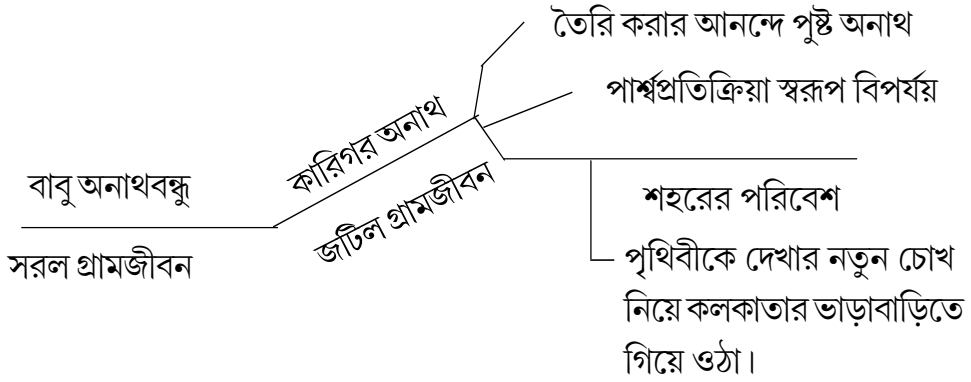

খ. বংশী কাপালী : বিবাহ পরবর্তী শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসে তেলেভাজার দোকান দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস। কঠিন পরিশ্রম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হাতিয়ার করে ধীরে ধীরে ব্যবসার সম্প্রসারণ। তামাকের বস্তায় তামাকের পরিবর্তে ভাগ্যক্রমে বস্তাভর্তি টাকা পাওয়া। কঠোর পরিশ্রম, সঠিক পরিকল্পনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাগ্যকে সঙ্গী করে সাফল্যের সিঁড়ি দীর্ঘ হওয়া। একসময়ের স্বপ্নের মানুষ অনাথবন্ধুর ঈশ্বরীতলার সমস্ত সম্পত্তি কিনে নেওয়া এবং সেই গ্রামের সবচেয়ে সম্মানীয়, শ্রদ্ধেয়, ধনী মানুষ হয়ে ওঠে টোবাকো মার্চেন্ট বি.সি. কাপালি।

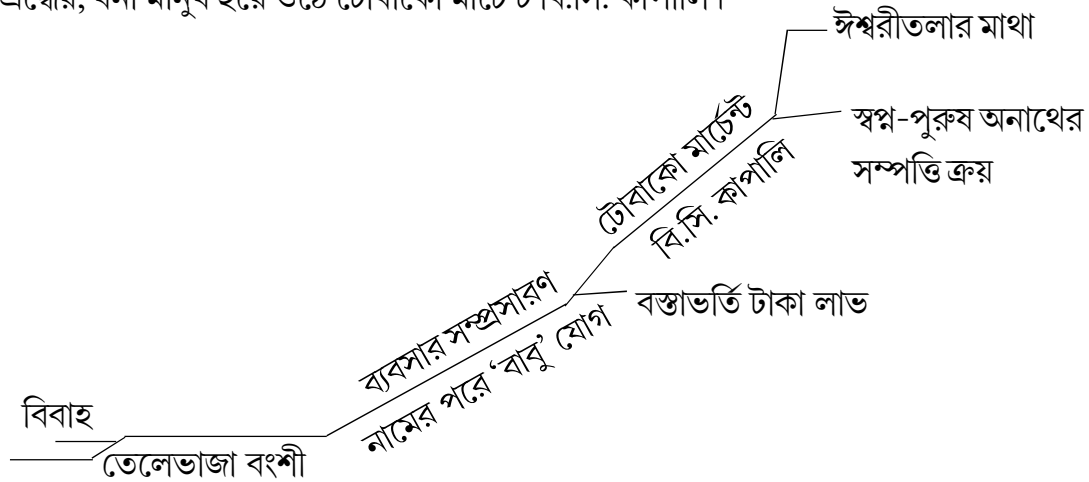

গ. সন্তোষ টাকি: ঈশ্বরীতলায় দুর্ধর্ষ ডাকাত হিসাবে জীবনধারণ। রাজনৈতিক প্রয়োজনে প্রার্থী দক্ষিণা চক্কোত্তির ডানহাত হয়ে ওঠা। দক্ষিণা চক্কোত্তির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে জীবনচর্যায় পরিবর্তন। যাযাবার অনিশ্চিত ডাকাতি জীবন ভুলতে বসা। শেষের দিকে রিনির সঙ্গে সম্পর্ক। মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন ঘটা। 'ভদ্দরলোকেদের জীবন'— এর প্রতি লোভ মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। কিন্তু নিজের অতীত কর্ম ও মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন তার জীবনে মৃত্যুর পদচিহ্ন এঁকে দেয়।

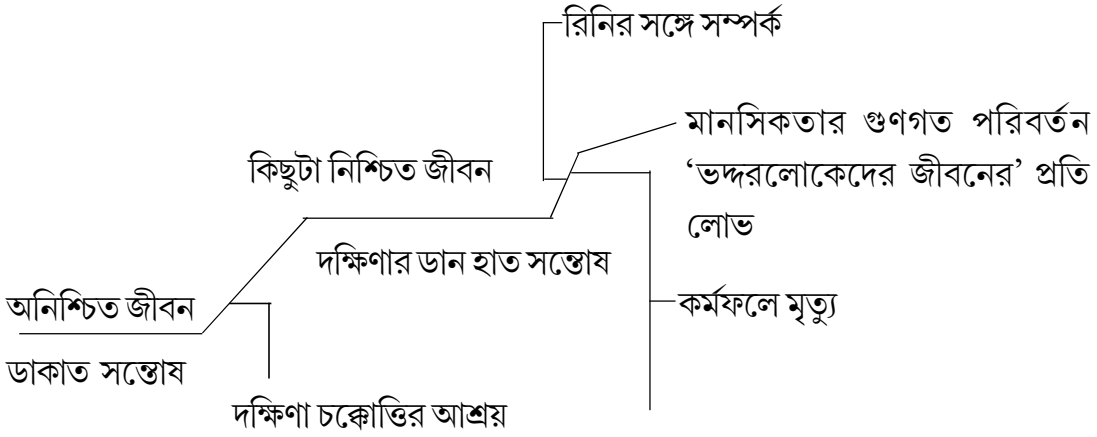

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপরিউক্ত তিনটি কাহিনিই উপন্যাসে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেছে— তাদের পরিণতিও স্বতন্ত্র। এই উপন্যাসেও পাঠগত আধিপত্য লাভ করা অনাথবন্ধু বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করেছে কুবেরের মত। তিনটি কাহিনির মধ্যে দুটি কাহিনি যেখানে শেষ হচ্ছে— তা নতুন আখ্যান সম্ভাবনাকে লালন করছে। ফলে এটিকে আমরা রৈখিক প্লটের উদাহরণ হিসাবে ধরতে পারি। তিনটি কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্রদের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে 'পূর্ব সংকেত' শিল্পকৌশল ব্যবহার করেছেন লেখক। যথা—

ক. অনাথবন্ধু বসু— পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে অনাথের পোষ্যদের মৃত্যু। ধীরে ধীরে তারপর অনাথ এগিয়ে গিয়েছে সমূহ বিপর্যয়ের দিকে।

খ. বংশী কাপালি— ষোলোতম পরিচ্ছেদে তামাকের বস্তায় নোটের তাড়া পাওয়া— কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হলো ভাগ্যদেবী। এরপর অতিদ্রুত সাফল্যের সিঁড়ি টপকানো।

গ. সন্তাষ টাকি— অতীত জীবনের কৃতকর্মের ঋণ পরিশোধ না করেই সামাজিক জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার চেষ্টা। স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই গণপ্রহারে মৃত্যু।

'পূর্ব সংকেত' শিল্পকৌশল হিসাবে ব্যবহার করায় কাহিনি তার নির্দিষ্ট গতিতে, স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ফলে 'আকস্মিকতা ' লেখক সহজেই এড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

কাহিনিবৃত্তের পরিণতি হিসাবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্লটে দু'ধরনের প্লট গঠনই দেখা যায়। একটি হলো বিবৃত সমাপ্তি (Open Ended)। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'অনিলের পুতুল', 'অলীকবাবু', 'আলো নেই', 'এক সিংহ ও তার রমণী', 'গঙ্গা একটি নদীর নাম', 'জলপাত্র', 'দশ লক্ষ বছর আগে', 'নতুন ভুবন', 'নির্বান্ধব', 'ভালোবাসিব না আর', 'যতীন দারোগার বেদান্ত', 'সওদাগর', 'সিদ্ধকামিনী', 'অদ্য শেষ রজনী', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' ইত্যাদি। প্লট গঠনের দ্বিতীয় শ্রেণিটি হলো, বৃত্তায়িত সমাপ্তি (Close Eneded)। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 'কুবেরের বিষয় আশায়', 'পরস্ত্রী', 'সতী অসতী', 'হাওয়াগাড়ি', 'বাম অলিন্দ', 'অদৃশ্য ভূমিকম্প', 'কামিনীকাঞ্চন', 'মহাজীবন','তারসানাই', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন', 'কন্দপ দর্পণ', 'বড় হওয়ার আগে', 'স্বর্গে তিন পাপী', 'টানেলের ভেতরে ট্রেন' ইত্যাদি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ফিরোজা' উপন্যাসটি একটি সরল প্লটের উদাহরণ। এই প্লটে রয়েছে চারদিকে হিংসা, মারামারি, বদলা, প্রতিহিংসা, ভাঙন, পতন, উত্থান ইত্যাদির মাঝখানেও দুটি মানুষের ভালোবাসার প্রতি গভীর আস্থা। যার মধ্যে মানুষের বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। উপকাহিনি নেই। স্মৃতিচারণ ও বর্তমান পরিস্থিতি— উভয় সময়কে ধরে আছে জন্মভূমির প্রতি গভীর টান ও প্রতিশোধ-হিংসা ভুলে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা। কাহিনি বিস্তারের কৃপণতা, সূচনা বাক্য থেকেই পরিণামের দিকে তীরবেগে ছুটে চলা, স্বল্প চরিত্রের উপস্থিতি ইত্যাদি আমাদের মনে ছোটগল্পের ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করে। ঠিক প্রায় একই রকম ব্যাঞ্জনা আমরা পাই শ্যামলের 'স্বর্গে তিন পাপী' উপন্যাসে। এটিও একটি সবল প্লটের উপন্যাস। এখানে তিন বন্ধুর আত্মউপলব্ধির কথা ফুটে উঠেছে— এই আত্মউপলব্ধির পরিধির মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্ব, শারীরিক আকর্ষণ, গুপ্ত অভিসন্ধি। এই উপন্যাসের আত্মউপলব্ধির বিন্দুটি ছোটগল্পের মত 'চরম মুহূর্ত'-এর ব্যঞ্জনা দেয় এবং সেখানেই উপন্যাসের 'সমাপ্তি' যেন ছোটগল্পের পথ অনুসরণ করে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব ছোটগল্পের মত অনিশ্চয়তা, আকস্মিকতা, প্লট গঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। যদিও আমরা জানি, পাঠকের সামনে অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতা উপস্থিত করতে হলেও তা কাহিনিবৃত্ত তৈরির অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত হবে। লেখক এই বিশেষ রীতির অমান্য

না করেই পাঠকের সামনে এক ধরনের অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতা উপহার দেয়। কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। যেমন— 'জলপাত্র' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে যখন ঋষিরাজ পুরকায়েত তার বাড়ির পরিচারিকা কুন্তি মান্নার সঙ্গে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কুন্তির গ্রামের বাড়ির দিকে রওনা দেয় তখন পাঠকও এক ধরনের অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে সেই যাত্রাপথে সামিল হয়। শেষপর্যন্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক বা সফল হবে কিনা সে বিষয়ে খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও ঋষিরাজের কুন্তির গ্রামের বাড়িতে ওঠা নিয়ে কোনও সন্দেহ লেখক পাঠকের মধ্যে তৈরি করে না। কিন্তু আমরা কাহিনিতে দেখতে পাই, কুন্তির হেঁড়িয়া-বেচবেড়িয়া গ্রামে ঢোকার অনেক আগেই মাদাখালি গ্রামে নিশুতি রাতে যখন চারিদিকে শুধু নিঃঝুম ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাজত্ব সেখানে ঋষিরাজের যাত্রা খানিকটা যেন আকস্মিকভাবেই থেমে যায়। উদ্দেশ্য সফল হওয়া তো দূরের কথা, উদ্দিষ্টের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হয় না ঋষিরাজের। কিন্তু লেখক সফল হয় উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত নির্মাণের মধ্যে থেকে পাঠকের সামনে আপাতদৃষ্টিতে অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতা উপহার হিসাবে তুলে ধরতে। গভীরভাবে কাহিনি বিশ্লেষণে দেখা যাবে, যাত্রার শুরু থেকে কুন্তিকে প্রতিনিয়ত গালি দিয়ে সম্বোধন, উনিশ শতকীয় 'বাবু' মানসিকতায় নিজেকে উপস্থিত করার চেষ্টা, জলপাত্র করে রাখার পুরানো নোংরা মানসিকতায় ঋষিরাজ উপলব্ধিই করতে পারেনি বদলে যাওয়া সময়কে। কুন্তী প্রথম থেকেই একটি লোভনীয় টোপ সামনে রেখে নিজের পরিকল্পনা মতো কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ঋষিরাজের ওপর আমাদের অতিরিক্ত ফোকাস থাকার ফলে কুন্তির আচরণ আকস্মিক ও ঋষিরাজের উদ্দেশ্যে অনিশ্চয়তা আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই। কিন্তু লেখক নিপুণ শিল্পীর মত কাহিনির অন্তর্গঠনেই এই অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতার বীজ রোপিত করেন। লেখকের এই গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই 'কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল' উপন্যাসে, সেখানেও কুন্দনলালের মৃত্যু হয় নিজেরই ছেলে প্রবীরের হাতে। আবার 'যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসে যতীনের মনস্তাপ, মালতীর ভবিষ্যৎ ও নেপালের যতীনের প্রতি সহমর্মী হয়ে ওঠা কাহিনির সমাপ্তিতে একটি অনিশ্চয়তা ও আকস্মিকতার সামনে আপাতদৃষ্টিতে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয়। আবার 'কহেলগাঁও' উপন্যাসে স্বরূপ ও মশায়ের তর্ক যেন আকস্মিকভাবেই শুরু হয় এবং স্বরূপের সঙ্গে রণেনের বন্ধুত্ব এক অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে যায়। 'মাতৃচরিতমানস' উপন্যাসে শুরু থেকেই আভা-অসিতের সম্পর্ক নিয়ে প্রবল আপত্তি জানানো আভার দুই পুত্রবধূ রুবি ও সরমা আভার মৃত্যুর পর অসিতের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। এটাকেও আমরা পাঠকের সামনে

আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিকতা-অনিশ্চয়তা তুলে ধরা বলতে পারি। 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কাহিনি শেষ হচ্ছে মাঝ গঙ্গায়। যখন ইঞ্জিন চালু করা যাচ্ছে না ভুটভুটির, বরফ গলে গিয়ে ভেটকি-ইলিশ দুই-ই পঁচতে শুরু করেছে, আশেপাশে ডাঙার কোনও অস্তিত্ব নেই। হাজরা হালদার ও মুকুন্দ পালের ভবিষ্যৎ আকস্মিক অনিশ্চয়তা নিয়ে পাঠককে যেন জোর ধাক্কা দিয়ে যায়। 'ভালবাসিব না আর' উপন্যাসে জন্মান্তরের স্মৃতি মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কাহিনির শেষে খুকুকে বাঁধা দেবার সময় সদ্য সাবালক হয়ে ওঠা পটলের সঙ্গে খুকুর একটি বৃত্ত সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলে লেখক থেমে যান। যেন পাঠকের কাঁধে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় এই সম্ভাবিত বৃত্তের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে। তবে এটি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গঠননৈপুণ্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় একই রকম পদ্ধতিতে বীরেনের সংশয় সমাধানের দায়িত্ব বর্তায় পাঠকের কাঁধে 'এক গেরস্তর তিন সংশয়' উপন্যাস পাঠে।

অনেক ঔপন্যাসিক কাহিনি-বিন্যাস রীতিতে নাটকীয়তার উপাদান ব্যবহার করেন। ফলে উপন্যাসের মধ্যে নাট্যধর্ম প্রকাশিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো নাট্যর্ধম বা নাটকীয় উপাদান বলতে আমরা কী বুঝি? আর কেনই বা লেখকদের প্রয়োজন হয় উপন্যাসে এটা ব্যবহার করার? আসলে জীবন যেখানে ঘটনাবিমুখ বা ঘটনার স্বল্পতায় প্রকাশমান কিংবা জীবন যেখানে নিস্তরঙ্গ নদীর মত বহমান সেখানে সেই জীবনকে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলা বা সজীব করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করার জন্য উপন্যাসের মত ধীর লয়ের আঙ্গিক যথোপযুক্ত। কিন্তু যেখানে জীবন দ্বন্দ্বপ্রধান, ঘটনাপ্রধান, টালমাটাল অস্থির জীবনপ্রবাহ, সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনকে মুহূর্ত ধরে অনুভব করার চেষ্টা, সেখানে সেই জীবনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়। সেই জীবনকে জীবন্তভাবে প্রকাশের জন্য নাট্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। আর আমরা জানি, জীবন বিচিত্র, জীবন বহুমুখী; আর সেই বিচিত্র বহুমুখী জীবনের সামগ্রিক প্রকাশ একমাত্র উপন্যাসের আঙ্গিকেই সম্ভব। ঠিক এই কারণেই উপন্যাসে যে জীবন প্রকাশিত হয়, তার প্রকৃতি অনুযায়ী লেখক নাটকীয়তা, কাব্যিকতা, ছোটগল্পীয় বৈশিষ্ট্য, প্রাবন্ধিক তথ্যনিষ্ঠা ইত্যাদি নানান উপাদান লেখক ব্যবহার করেন। উপন্যাস তার আঙ্গিক নমনীয়তার জন্য উপরিউক্ত সমস্ত শিল্পকৌশলের বৈশিষ্ট্যকে সহজেই আত্মীকরণ করে নিতে পারে। এজন্যই হয়তো একমাত্র উপন্যাসের আঙ্গিকেই বিচিত্র বহুমুখী জীবনের সামগ্রিক পরিচয় লেখকরা ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আর দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে জন্ম নেওয়া যে লেখকের শৈশব-কৈশোর পর্ব শুধু ঘটনার ভেতরে বাস করে; শুধু তাই নয়, দেশভাগ, উদ্বাস্তু

সমস্যা, শুধু লেখার জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটে; সেই লেখক অর্থাৎ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করবেন— এটাই তো স্বাভাবিক।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই নাটকীয় উপাদান ব্যবহার করেছেন। এখানে আমরা কিছু নির্বাচিত উপন্যাসে সংক্ষেপে নাটকীয় উপাদানের প্রয়োগ উল্লেখ করব। 'দশ লক্ষ বছর আগে' উপন্যাসে কাহিনির সূচনাতেই একটা অদ্ভুত জন্তুর কথা বলে নাট্যোদ্বেগ সৃষ্টি করেন লেখক। তারপর দেখতে পাওয়া ও না-দেখতে পাওয়া মানুষদের সেই জন্তুটি সম্পর্কে ধারণা ও বিশ্লেষণ পাঠকের মধ্যে উত্তেজনা ও আগ্রহ তৈরি করে। এই নাট্যোৎকণ্ঠাকে হাতিয়ার করেই লেখক নতুন জীবনের অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী আগমনের বিষয়ে ঢুকে যান। কাহিনির সমাপ্তিতে আরতি কুণ্ডু জানান, ''না কিছুতেই দেবে না। সে আসুক। সে নতুন। আমাদের তো দিন ফুরিয়েছে এলসা।''[৮] এভাবেই লেখক প্রকাশ করেন সময়-নিয়তি। প্রায় একই রকম নাট্যোৎকণ্ঠা আমরা দেখতে পাই 'একদা ঘাতক' উপন্যাসে। সেখানে একদা নকশাল বিপ্লবী সুকুমারের পরিচয় সুধা ও পাঠক জানে। কিন্তু জানে না সুকুমারের বাগদত্তা রাধা। যে রাধাকে নিয়ে সুকুমার পুনরায় নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখে। সুকুমারের আশঙ্কা যদি রাধার কাছে তার অতীত জীবন উন্মোচিত হয়ে যায়, তাহলে নতুন জীবনের সব স্বপ্ন-সাধ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। এই জন্য তার অতীত জানা সুধাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিতে চায় যে, যেখানে সুধা সুকুমার সম্পর্কে সত্যি কথা বললেও, মানুষ বলবে এটা পাগলের প্রলাপ। শেষপর্যন্ত সুধা কিংবা সুকুমার— কে তার উদ্দেশ্যে সফল হয়, এই উৎকণ্ঠা বা নাট্যোৎকণ্ঠা পাঠকের মধ্যে সর্বক্ষণ বজায় থাকে। শুধু তাই নয়, উপন্যাসের কাহিনিধারায় 'আকস্মিকতা'-র ব্যবহার করেন লেখক যখন সুকুমার সুধার স্মৃতিনাশ করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে কোনও রকম জোগাড়যন্ত্র ছাড়াই নিজেরই স্মৃতিনাশ ঘটে। সুকুমারের অতীত পরিচয় সম্পর্কে এখানে লেখক উপন্যাসের চরিত্র রাধা ও পাঠকের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেন। নাটকের পরিভাষায় একে নাটকীয় ব্যাজস্তুতি বলে যাতে দর্শকমনে একই সঙ্গে উদ্বেগ, বেদনা, আশঙ্কা, কৌতুক ইত্যাদি অনুভূতির সৃষ্টি হয়। 'ফিরোজা' উপন্যাসে ফিরোজাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনের রাজাকার বাহিনির এক সমর্থক রশিদকে মুক্তিবাহিনির সদস্যদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাতের বেলায় অভিযানে বের হওয়া, শেষপর্যন্ত রশিদের পরিণতি নিয়ে উদ্বেগ ইত্যাদির মাধ্যমে এখানেও লেখক নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছেন। আবার 'অলীকবাবু' উপন্যাসে দু'জন মানুষের সাক্ষাৎপর্বের আগে নাটকীয় উত্তেজনা

সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত লেখক চরিত্র রমেন ঘোষের সঙ্গে পাঠকও যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে ছদ্মবেশধারী রমেন ঘোষের প্রকৃত পরিচয়-রহস্য জানার জন্য। উপন্যাসের পুরো কাহিনি জুড়ে এই নাট্যোৎকণ্ঠা লেখক বজায় রাখেন। দুই রমেন ঘোষের চরিত্রকে ব্যবহার করে লেখক এই নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছেন। 'ভালবাসিব না আর' উপন্যাসে কাহিনির শেষে একদিকে কমলেশের খুকুকে আহ্বান ও অন্যদিকে খুকুকে পটলের বাধা দেওয়া— এই অংশে নাট্যোৎকণ্ঠা তৈরি করেছেন। ফলে পাঠকও উত্তেজনার সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকে খুকুর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে বা পটলের আচরণ বিষয়ে। 'তৃতীয় মেরু' উপন্যাসেও কাহিনির শেষে তীব্র নাটকীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয় যখন টগর ওরফে অনিমেষ শ্রীকুমার বেদান্ততীর্থকে জানায়, সে শ্রীকুমারের পুরানো অতীত কার্যকলাপ ফাঁস করে দিবে সবার কাছে। শুধু তাই নয়, যখন অনিমেষের সঙ্গে শ্রীকুমারের বাদানুবাদ চলছিল তখন অনিমেষ শ্রীকুমারকে আত্মহত্যার জন্য প্রবল মানসিক চাপ তৈরি করে। দু'জনের এই বাদানুবাদে একটি চরম উৎকণ্ঠা তৈরি হয় কাহিনিতে যেখানে অসুস্থ বৃদ্ধ শ্রীকুমার এই চাপ সহ্য করতে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলে। নাট্যোৎকণ্ঠা ও নাটকীয় ব্যাজস্তুতির সার্থক উদাহরণ হলো 'আবিষ্কার' উপন্যাস। নিতাই ডাক্তার ও ভক্তির প্রকৃত সম্পর্কের উন্মোচন, নিতাই ডাক্তারের পরিচয়-রহস্য উদ্‌ঘাটন, নিতাইয়ের অতীত কার্যকলাপ, নির্মল ও ভক্তির পালানোর পরিকল্পনা— সবই নাটকীয় উপাদানের সাহায্যে লেখক কাহিনি বিবৃত করেছেন। 'এক সিংহ ও তার রমণী' উপন্যাসে রজনী ও বুধুয়া নামক সিংহের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেও নাটকীয় উপাদান বর্তমান।

লেখক 'জীবনরহস্য' গ্রন্থে বলেছেন, ''মার্কেস এসে পড়ায় বাজারে খুব ম্যাজিক রিয়ালিটির কথা শোনা যায়। ব্যাপারটার নাম জানতাম। সেদিন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশিরকুমার দাস বলল, ওটা নাকি আমার অনেকদিনই আছে। দেখলাম হ্যাঁ। সেই বৃহন্নলা উপন্যাসের সময় থেকে— তিরিশ বছর আগে— যে উপন্যাসের নাম এখন অর্জুনের অজ্ঞাতবাস। অনিলের পুতুলে স্বপ্নের ভেতর ময়ূর এসে মৃত দাদার চোখ খুঁটে খাচ্ছে লিখেছিলাম। সেসব নাকি ম্যাজিক রিয়ালিটি। আসলে লেখার বীজে যখন ভাষা দিয়ে কিছুতেই পৌঁছাতে পারি না, তখন অস্থির দশায় ওইসব পাগলামির জায়গায় পৌঁছে যাই।''[৯] উপন্যাসে 'অলৌকিকতা', 'কাল্পনিকতা', 'স্বপ্ন' ইত্যাদির ব্যবহার উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই লেখকেরা নানাভাবে বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে আসছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই ব্যবহারের যৌক্তিকতা বা প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? আমরা জানি, উপন্যাসের ভিত্তিভূমি হলো

বাস্তবতা বা বাস্তব জীবন। বহুরঙে রঞ্জিত, বহুদিকে ধাবিত, বহুধারায় প্রবাহিত মনের অন্তহীন বাঁক, স্তর, নানান অলি-গলি নিয়ে যে 'মানব হৃদয় ও মানব চরিত্র'— তা সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার জন্যে লেখক এই 'অলৌকিকতা', 'কাল্পনিকতা', 'স্বপ্ন' ইত্যাদি উপাদানের ব্যবহার করেন। আসলে লৌকিক জীবনকেই পরিস্ফুট করতে গিয়ে লেখক অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস নিয়ে দেখব তিনি কীভাবে নানা মাত্রায় 'অলৌকিকতা' বা 'কাল্পনিকতা' বা 'স্বপ্ন'-এর ব্যবহার করেছেন।

'অনিলের পুতুনল' উপন্যাসে লেখককে অনিলের একটি আপাত উদ্ভট স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করতে দেখি। শ্যামল তাঁর অনেক উপন্যাসে স্বপ্নের মাধ্যমে অলৌকিকতা এনেছেন। অনিল তার স্বপ্নে একদা মৃত খগেশ দাদাকে বাড়িতে আসতে দেখে। তার দাদা যে এতদিন বেঁচে আছে এবং তার সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে বাড়িতে এসেছে— এই ঘটনা তাকে চমকে দেয়। এত বড় আবিষ্কার (দাদার বেঁচে থাকা) জানতে পেরে সবাইকে বলার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আবার সেই দাদার সঙ্গে আনা সাদা ময়ূর, যে কিনা চোখ খেতে ভালোবাসে এমনকি মানুষেরও, সেই ময়ূরটি শেষে অনিলেরই চোখ খেতে উদ্যত হয়। অনিলের এই পুরো স্বপ্নটি অনিলের সাধারণ গতানুগতিক জীবনে একটি অলৌকিক ক্ষেত্র তৈরি করে। আসলে দাদা খগেশের অকালমৃত্যু, জীবনের যাত্রাপথে এক সঙ্গী-অবলম্বন হারানো অনিলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধান এই গভীর অভিঘাতকে মনের চেতন স্তর থেকে অবচেতন বা অচেতন স্তরে সরিয়ে ফেলে। আর স্মৃতি তো অবিনাশী। ফলে সেই অভিঘাত-স্মৃতি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ফিরে আসে অনিলের জীবনে। ঘটনা-বিরল অনিলের এই স্বপ্ন দেখার আগে তার ভাবনা দেখা যেতে পারে, ''তার ওপর দাঁতের ব্যথা। মুখ ফুলে গেছে। সেদিন রাতে এসব কথাই ভাবছিল হয়তো। সেজোর অবস্থাও ভালো না। ঘুম ভেঙে উঠে মনে হচ্ছিল, কিছুই করবার নেই। হয়তো মরবারও নেই। কিছুই নেই। কতদিন আগে ছোট ছিলাম। সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। সেখান থেকে এখন আরম্ভ হলে এই এখন অনেক দেরিতে আসত। ভাবা যায় না। অনিলের বোধ হয় মনে হচ্ছিল, চারখানা দেওয়াল যদি ঘটঘট শব্দ করে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে তবে সবেচেয়ে ভালো হয়। এতদিনে তাহলে একটা ঘটনা ঘটে।''[১০] এই স্মৃতিকাতরতা, ঘটনা বিরল সাধারণ গতানুগতিক জীবন, সঙ্গী-অবলম্বন হারানো ইত্যাদি বিষয় প্রতীক-অলৌকিকতা জুড়ে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অনিল দেখে। অনিলের এই ভাবনা

সাধারণ উপায়ে দেখাতে না পেরেই লেখক দ্বারস্থ হয় প্রতীক-অলৌকিকতায়।

'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কাহিনির একেবারে শেষের দিকে কুবেরের চাঁদ সম্পর্কে ভাবনা ও কার্যকলাপ অলৌকিকতার উপাদান দিয়ে তৈরি। কুবেরের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে। তারপর কুবের জীবনের যেসব বাঁক পেরিয়ে যে উচ্চতায় পৌঁছায় তা অনেকটা যেন চাঁদে পৌঁছানোর মত। যে সমাজ ও সংস্কার ছেড়ে যে নতুন সমাজ ও সংস্কারে এককভাবে ঢোকার চেষ্টা এবং সেখানে থিতু হবার ব্যর্থ প্রয়াস লেখকের বর্ণনায় এইভাবে ফুটে ওঠে, ''এইমাত্র কুবের মইসুদ্ধ কাত হয়ে নিচে পড়েছে। টাল রাখতে পারেনি। চাঁদ বড় স্লিপারি।''[১১] চাঁদ যেন এখানে বুর্জোয়া সমাজের প্রতীক হিসেবে উঠে আসে এবং এই চাঁদের নতুন রূপের সন্ধান বা আবিষ্কার কুবেরের কাউকে বলতে না পারার কারণ হয়তো এই সমাজে তার একক অনুপ্রবেশ। এই সমস্ত বিষয় তুলে ধরতেই লেখক এখানে অলৌকিকতার উপাদান ব্যবহার করেছেন। আর তাছাড়া মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের চাঁদ সম্পর্কে রোমান্টিক ভাবালুলতার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে পুরো দৃশ্যটি কল্পনা করা হয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি কুবের তার ছেড়ে আসা সমাজ ও সংস্কার মন থেকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি কখনও। 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে নিবারণ পাকড়াশির বন্ধুত্ব, ভালোবাসাবাসি, আত্মা নিয়ে যে ভাবনা-চিন্তা ও কার্যকলাপ তা লেখকের বন্ধুত্ব , নিঃসঙ্গতা, ভালোবাসাবাসি-মেশামেশি ইত্যাদি প্রসঙ্গকে রূপায়িত করেছে। আসলে লেখক এই সব প্রসঙ্গের তীব্রতা, নিবিড়তা, প্রচণ্ডতা ইত্যাদি বোঝাতে গিয়ে হিটলারের মত ব্যক্তিত্ব ও নানান অলৌকিক উপাদান নিয়ে আসেন। নিবারণের যে যন্ত্রণা তা লৌকিক উপায়ে যাথাযথভাবে উপস্থাপন করতে না পেরেই লেখককে এই পথ অবলম্বন করতে হয়।

'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে আমরা দেখি অনাথবন্ধু বসু মনুষ্যতর প্রাণীর সঙ্গে কথা বলছেন, উভয়ের মধ্যে ভাষা বিনিময় হচ্ছে। আপাততদৃষ্টিতে বিষয়টি অলৌকিক মনে হলেও এটা সহানুভূতি ও মমত্ববোধের চূড়ান্ত নিদর্শন। অনাথবন্ধুর সঙ্গে তার পোষ্য মনুষ্যতর প্রাণীর যে গভীর সম্পর্ক, উভয়ের মধ্যে যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, যত্নশীল ইত্যাদি মনোভাব— সেটাকেই যেন প্রকাশ করতে উভয়ের মধ্যে ভাষা বিনিময় ঘটিয়েছেন লেখক। একে অপরকে বুঝতে পারার একটি কৌশল হিসাবে লেখক এখানে মানুষের মধ্যে মনুষ্যতর প্রাণীর ও মনুষ্যতর প্রাণীর মধ্যে মানুষের ভাষা প্রয়োগ করেছেন লেখক। এই কৌশল লেখকের অন্যান্য উপন্যাসেও দেখতে পাই। যেমন— 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসে খগেনের সঙ্গে মাদি কেউটের কথাবার্তা, 'চন্দনেশ্বর জংশন'

উপন্যাসে বজরার সঙ্গে মজানদীর ধারে বড়ো বড়ো পাথরের সঙ্গে কথাবার্তা, 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে হাজরা হালদারের সঙ্গে মনুষ্যতর প্রাণীর কথাবার্তা। সবক্ষেত্রেই লেখক নিবিড়তা, ঘনিষ্টতা, ভিন্ন প্রজাতি ও জীব-জড়ের মধ্যে আত্মীয়তা বোঝানোর জন্য ভাষা ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগ করেছেন। লেখকের গঠন-কৌশলের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তাজ মহম্মদের স্বপ্ন আমাদের বঙ্গদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাস, ভূগোলকে সুকৌশলে তুলে ধরে। আর একথা তো আমরা সবাই জানি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য বঙ্গদেশের নদীপথ, বাণিজ্য-বন্দর, (বিশেষ করে মনসামঙ্গল কাব্য) সামাজিক জীবনযাত্রার (মঙ্গলকাব্যের 'নরখণ্ড') বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' উপন্যাসে গঙ্গা নদী ও তার দু'পাশে গড়ে ওঠা জীবনযাত্রা ও বদলে যাওয়া জীবনযাত্রাকে তুলে ধরতে তাজ মহম্মদের স্বপ্নের মাধ্যমে ইতিহাসের শরণাপন্ন হয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য যোগসূত্র তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ না করেই তিনি একাজে সফল হয়েছেন। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে অঙ্গীভূত একটি বিষয়। সাধারণ মানুষের চোখে এটি অলৌকিকতার একটি অন্যতম নিদর্শন হলেও এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে তুলে ধরতে গেলে অলৌকিকতা ও কাল্পনিকতার মোড়ক অবশ্যম্ভাবী। লেখক যেহেতু বহুমুখী জীবনের বৈচিত্র্য তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাই লেখকের অনেক উপন্যাসেই উক্ত বিষয়গুলোর বিশ্বাস, চর্চা যথাযথরূপে ধরা দিয়েছে। যেমন, 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'সিদ্ধকামিনী', 'কঠিন সময়' ইত্যাদি উপন্যাস। জীবনবিশ্বাস-বৈচিত্র্য তুলে ধরাই লেখকের এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করেছে। ঠিক এই ধরনের একটি বিশ্বাস হলো জন্মান্তরবাদ বা জাতিস্মর। যার হাত ধরে অনায়াসেই উপন্যাসের কাহিনিতে প্রবেশ করে আপাতদৃষ্টিতে কিছু আজগুবি ঘটনা। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ভালবাসিব না আর' ও 'গত জন্মের রাস্তায়' উপন্যাস দুটি। আসলে লেখক যখন বাস্তব জীবনকে তুলে ধরেন তখন সহজাতভাবেই এসে যায় জীবনের নানা বিশ্বাস, চর্চা, অনুশীলন, কার্যকলাপ ইত্যাদি। এই সব কিছুই যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় খাপ খেয়ে চলে না বা এক জীবনের বিশ্বাস অন্য জীবনের কাছে অলৌকিক বা আজগুবি মনে হয়। কোথাও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কোথাও বা অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু লেখক যেহেতু জীবনবিশ্বাস-বৈচিত্র্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ, সেহেতু উপন্যাসের কাহিনি গঠনে অলৌকিকতার উপাদান মিশ্রিত হয় লেখকের নিজস্ব শৈল্পিক নৈপুণ্যতায়। আর এখানেই পার্থক্য সৃষ্টি হয় বাস্তববাদী

উপন্যাসের সঙ্গে শিশু-কিশোর মনোরঞ্জনকারী অলৌকিক-আজগুবি উপন্যাসের।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাহিনি-বিন্যাস রীতিতে কীভাবে স্বপ্ন ও স্বপ্নের মধ্যে ঘটা ঘটনার যোগসূত্র স্থাপন করেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে 'হিম পড়ে গেল' উপন্যাসে। এখানে দেবকুমার বসু স্বপ্ন দেখছেন কিন্তু তার আগে লেখক জানাচ্ছেন, ''দেবকুমার বসু তার বাঁধান কবিতার খাতায় একদম কাটাকুটি না করে এ কথা ক'টি লিখে ফেলল। লিখে বুঝল সে যে জায়গায় পৌঁছতে চাইছে— সে জায়গায় যেতে পারছে না। এই শরীর আরও কোনো প্রবীণ শরীরের উত্তরাধিকারী। জন্ম জন্মান্তরের কোনো অতি প্রবীণ প্রবৃদ্ধ বাবা থেকে তার এই শরীরের শুরু। কোনো অতি বৃদ্ধ বানর পিতা নানা জীবনের ভেতর দিয়ে তাকে এই শরীর দিয়েছেন। সে শরীরের রক্তে পৃথিবীর সমবয়সী ঘ্রাণ। অস্থিতে মাটির জন্মের সময়কার দাগ। ...''[১২] এরপর লেখক দেবকুমার বসুর স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন, যেখানে ছোটবেলার প্রিয় লেখক সুকুমার দে সরকারের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে। আত্মঘাতী হরিণ, পাতাল ইত্যাদি প্রসঙ্গও উঠে আসছে। সময়ের প্রবাহমানতা, স্মৃতি-চেতনা-বোধির যে যাত্রাপথ, তা হয়তো এভাবেই দেখানো সম্ভব। ফলে এই স্বপ্ন-কল্পনা আমাদের কাছে কাহিনিচ্যুত বা আরোপিত কোনও ঘটনা মনে হয় না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সর্বদা পাঠককে তৈরি করে নেন সেই স্বপ্ন-কল্পনার জগতে প্রবেশ করার আগে। এই মায়াজগতে হরিণ তার কাছে একটি প্রিয় পশু। শ্যামলের কাছে নিষ্পাপ, সরল, সৎ ইত্যাদি অনুভূতির যেন সংমিশ্রিত রূপ হলো হরিণ। আর আমরা দেখেছি অনেক উপন্যাসেই প্রধান চরিত্রের মধ্যে 'সৎ' হবার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসেও দিলীপ বসুর সঙ্গী একটি বাচ্চা হরিণ। ভুতুড়ে গাড়ি, মৃত কালু ঘোষ ও হরিণের বাচ্চার সঙ্গে দিলীপ বসুর সম্পর্ককে লেখক এমনভাবে কাহিনির বাস্তবতায় মিশিয়ে দেয় যে উপন্যাসের সমাপ্তিতে অলৌকিক সব ঘটনাগুলো কাহিনি-সত্যের অন্তর্নিহিত বাস্তবতায় নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়। অলৌকিক অবাস্তবতার মধ্যে নিহিত লৌকিক বাস্তবতাকে কাহিনি বয়নের কৌশলে নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করার পদ্ধতি লেখক হিসাবে শ্যামলকে একটি নতুন উচ্চতায় স্থাপন করে। আমরা এই অধ্যায়ের সূচনাতেই বলেছিলাম ভাব প্রকাশের কৌশলই মূলত রচনা— এখানেই প্রধানত লেখকের সাহিত্য প্রতিভা প্রতিভাত হয়— এক লেখক থেকে অন্য লেখকের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই রচনা-কৌশল, নিজের বক্তব্য প্রকাশ-কৌশল প্রথম শ্রেণির শক্তিশালী লেখক হিসাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

'শিকড়' উপন্যাসে লেখকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা উঠে আসে। যে চরিত্রের

মাধ্যমে লেখক এই ধারণাগুলো পাঠকের সামনে পরিবেশন করেন, তিনি হলেন তপন গুহরায়। যে প্রতি পূর্ণিমায় উন্মাদ হয়ে যায়। গ্রহ-নক্ষত্র, লগ্ন-তিথি-রাশি, পাথর, মহাজাগতিক চেতনা, ব্রহ্মাণ্ডের শিকড় ইত্যাদি সূত্রে তপনের বিভিন্ন চিন্তাসূত্র কাহিনির মধ্যে একটি মায়াজাল তৈরি করে। এই সব বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছে বরাবরই রহস্যময়, আলো-আঁধারি ব্যাপার। ফলে লেখক অনায়াাসেই তার ভাবনা-বিশ্বাসকে পরিচালিত করে কল্পনা-সম্ভব ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সাধারণ মানুষের গতানুগতিক চিন্তাধারার বাইরে বিভিন্নধারার সম্ভাব্য ঘটনাধারার মধ্যে নিক্ষেপ করেন পাঠককে। 'দশ লক্ষ বছর আগে' উপন্যাসে এভাবেই একটি প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর কথা বলেন এবং একটি চরিত্রের মাস অনুযায়ী উন্মাদ হবার ঘটনায় পাঠককে একটি বৃহত্তর সত্যের দিকে ধাবিত করেন লেখক। আসলে লেখক অলৌকিকতা, স্বপ্ন, উদ্ভট কাল্পনিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, বৃহত্তর সত্য, বহুমুখী জীবন-বিশ্ব বৈচিত্র্য ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই ধরনের আরও অনেক উপন্যাস শ্যামলের রচনাসম্ভারে রয়েছে। যেমন, 'স্বপ্নসম্ভব', 'ডুব সাঁতারের বিপদ আপদ', 'এক সিংহ ও তার রমণী', 'হলদি নদীর সারেং', 'নতুন ভুবন' ইত্যাদি।

খ. উপস্থাপনা রীতি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের উপস্থাপন রীতির মধ্যে আমরা নিরীক্ষণ ও কথনরীতি— এই দুটি বিষয়ের আলোচনা করব। উপন্যাসে নিরীক্ষণ বা ফোকালাইজেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। কারণ লেখক এর মাধ্যমেই স্থির করেন, ''কাহিনীটি কার বা কাদের চোখ দিয়ে দেখা ও দেখানো হবে। কথক যেই হোক, তার চোখ দিয়ে যে সবসময় কথন-বিশ্ব দেখানো হবে, এমন কোনও পূর্ব শর্ত আখ্যান কথনে নেই।"[১৩] তাই নিরীক্ষণের মধ্য দিয়েই আখ্যানে বা কাহিনিতে প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে। যথা— অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিত। আর এই প্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয় কথনরীতি বা কথন পরিস্থিতি, চরিত্রের ভাষা ব্যবহার ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি। এই সমস্ত বিষয় যে কোনও উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করতে বা উপস্থাপন করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা এই পর্বে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অবলম্বনে উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করব।

আমরা আগেই জেনেছি যে, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আত্মজৈবনিক উপাদান দ্বারা নির্মিত। ফলে নিরীক্ষণ ব্যবহার করা হয় কাহিনিতলের কোনো মুখ্য

বা গৌণ ভূমিকা বা চরিত্রের। যদিও কথক কাহিনিতলের বাইরের একজন। তাই এই উপন্যাসগুলোতে ভূমিকানুগ কথনরীতি বা কথনপরিস্থিতি দেখা যায়। এই কথন পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক অমিতাভ দাস জানান, ''এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কখনও কথক, কখনও কাহিনিতলের কোনো চরিত্র বা ভূমিকা। কথক কাহিনীতলে অবস্থান করে না। ফলে কথকের বহিঃপ্রেক্ষিত এবং কাহিনীতলের ভূমিকাদের অন্তঃপ্রেক্ষিত দিয়ে গড়ে ওঠে ভূমিকানুগ কথন। ফলত অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় চলতে থাকে।''[১৪]

ভূমিকানুগ কথন, অন্তঃ-বহিঃপ্রেক্ষিত:

এখানে কথকই নিরীক্ষক, কিন্তু সে কাহিনির অন্তর্গত কোনও ভূমিকা বা চরিত্র নয়। ফলে তার নিরীক্ষণে জেগে ওঠে বহিঃপ্রেক্ষিত।

ক. ''এমন সময় এদিকে মুখ করে প্যাসেজে ভাতের ফ্যান গালাতে বসল বুড়ো বয়। ফাঁপানো চুল— তারও চোখে কাজল। হাঁড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্যান পড়ে ফাটা নর্দমা বুজে যাচ্ছে। উটকো হয়ে শব্দ করে বড় হাঁড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোলাতে লাগল লোকটা। হঠাৎ একসময় খারাপ চালের বিটকেল গন্ধ চারিয়ে গেল সারা ঘরে।''[১৫] (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ২৪)

খ. ''কলকাতায় বাসে-ট্রামে ঠাসাঠাসি, ফালি ফালি ঘর, শীতকালে সন্ধে হতেই ময়লা ভর্তি চাপ চাপ ধোয়ার দলা অতিকায় বাদুড় হয়ে ট্রামের তারে ঝোলে। তখন চোখ জ্বলে, নিঃশ্বাস টানা যায় না। আত্মঘাতী হওয়ারও ভালো জায়গা নেই। পুরানো আলিপুর, এদিক সেদিক দু'চারজন বাপকেলে সম্পত্তি আগলাচ্ছে। রোজ সকালে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জিনিসপত্রের আণ্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে গঙ্গাযাত্রা। এত লোক দিনের মধ্যে কতবার জলে সারে। ভাগ্যিস উপরটা রাস্তাঘাট দিয়ে মোড়া— দোকান পসার আলো দিয়ে সাজানো।'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ২৮৫)

গ. ''সেজো বিছানায় শুয়ে ছিল। দশমাস ধরে শুয়েই আছে। অসুখটা পার হওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। প্রথমে একদিন হঠাৎ হাত পা শক্ত হয়ে মুখ বন্ধ হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে দেখে ছেলেরা হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে সুস্থ হয়ে উঠতে জানা গেল সন্ন্যাসে ধরেছিল। মনে রাখতে হবে এই ভদ্রমহিলার বাবা ব্লাডপ্রেসার, লোভ, ব্যাবসায় বুদ্ধি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, উচ্চাশা এবং অতিরিক্ত কামে ভুগতেন। আর তিনি মরার বছর দশেক আগে থেকেই অর্শ আর ভগন্দরে বড় বেগ পান।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ১৯৩)

নিরীক্ষক : সুধা; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''প্রমথ আগের মতো হও। আদর কর। অঞ্জুকে কী দরকার। অঞ্জু ভালভাবে জানেও না তুমি কেমন লোক। কাছে এসে হাঁপাবে। পালাবার জন্যে জলে ডুববে। প্রমথ আগের মতো হয়ে যাও। এভাবে চললে মরে যাবে। ভাগলপুর গিয়ে মোটা হয়ে আসব। আগের মতো হব। দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। আমার চোখ সুন্দর না প্রমথ? দেখ।" (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ৩৪)

নিরীক্ষক: প্রমথ; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''কিন্তু গরুর ভুসি না হলেও সুধাকে ভাল লাগছে না। খারাপও লাগছে না। অপমান করা যায় না। ছেড়ে যাওয়া যায় না। সুধা বড় একা। আমি প্রমথ দত্ত, সুধাকে আগে ভালোবাসতাম। এখন কী করি জানি না। তবে জানি সুধার সঙ্গে আমার যোগ নেই। অবিনাশদা সেন্ট— পারসেন্ট কারেক্ট না হলেও প্রায় ঠিক। কৃতজ্ঞতার এ এক সং সাজানো প্রাণান্ত। সুধা তুমি চলে যাও— একথা মনে এলেও মুখে এল না।" (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ৩৬)

নিরীক্ষক: কুবের; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''সিগারেট, ধুলো, ধোঁয়া আরও কত কি এই শরীরটার ভেতর ভাঁজে ভাঁজে জমে যাচ্ছে। কুবেরের প্রায়ই ইচ্ছা হয় তার সারাটা শরীর যদি কোন সাইকেল সারানোর দোকানে আগাগোড়া খুলে ফেলে ডবল চেনে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারত— তাহলে জয়েন্টে জয়েন্টে তেল ঢেলে ঘষে মেজে নিত। বলা তো যায় না, এত দিনের মেশিন— কোথায় কী হয়ে আছে। বাঁ হাত উল্টে আঙুলের কালো কালো দাগগুলো দেখল।" (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ৩০০)

নিরীক্ষক: বুলু; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''বুলুর মন পড়েছিল এখানে। কিন্তু অন্য জায়গায় জট পাকানো একটা সুতো খুলে ফেলে দিয়ে তবে সুস্থির হয়ে বসা যায়। শাড়ি পাল্টে আজ তার নিজেকে দেখতে পেল না বুলু। ঘরের আয়নাগুলো ফলস্ লাগে তার। সিঁড়ির মুখে লম্বা আয়নায় নিজেকে পেয়ে গেল।" (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ২৬৮)

নিরীক্ষক : অনিল; অন্তঃপ্রেক্ষিত

''ডাক্তার হলে যে কী সুবিধে তা পুতুলের মাথায় কিছুতেই ঢুকবে না। প্রথম কথাই হল, কোনওদিন চাকরির জন্য ঘুরতে হবে না। তা ছাড়া বড় বড় অসুখ থেকে মাথা ধরা অব্দি যে কোনও অসুবিধেয় পড়লে কী করা দরকার তা নিজেই খানিকটা বুঝতে পারবে। রেডিওর বাল্‌ব্ আর

কম্পাউন্ডারের মিকশ্চারের দাম যা বলে তাই দিতে হয়। জানলে, হিসেব বুঝে দেওয়া যায়। সেরকম আর কি!" (অনিলের পুতুল, পৃ. ২৫৫)

নিরীক্ষক : নরেশ; অন্তঃপ্রেক্ষিত

"চেয়ারের চওড়া হাতায় রামায়ণখানা আছে। পড়বে বলে রোজ নামিয়ে বসে। এই বয়সে না কি ধর্মগ্রন্থ পড়তে হয়। মন তৈরি হয়। মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর— অন্য লোকে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর। নরেশদের সময় তারা ফুলশয্যার দিন টিটকারি মেরে গানটা গাইত। এখনও সে ভাবটা পাল্টায়নি। সে দিন কবে তা তো জানা নেই। মনের মধ্যে নেমে পড়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েও দেখা যায় না। সেখানটা ধোঁয়া ধোঁয়া। ট্রেনের মতো শব্দ করেও আসে না। হঠাৎ একদিন আসবে। নরেশের মনে হল যার যখন আসে তখন সেও বোধহয় কিছু টের পায় না।" (অনিলের পুতুল, পৃ. ২০৪) —এভাবেই কাহিনিতলের বাইরের কথকের বহিঃপ্রেক্ষিত এবং কাহিনির অন্তর্গত ভূমিকা বা চরিত্রের অন্তঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় ঘটে। ফলে নির্মিত হয় ভূমিকানুগ কথনরীতি বা কথন পরিস্থিতি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাস ভূমিকানুগ কথনরীতি দ্বারা নির্মিত হলেও অন্যান্য কথনরীতির উপস্থাপনা আমরা দেখতে পাই। যেমন, 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই সর্বজ্ঞকথনরীতি। যেখানে নিরীক্ষকই কথক কিন্তু নিরীক্ষক কাহিনির অন্তর্গত ভূমিকা বা চরিত্র না হওয়ার জন্য কাহিনি-বর্ণনায় আগাগোড়া বহিঃপ্রেক্ষিত প্রাধান্য লাভ করে।

সর্বজ্ঞকথন, বহিঃপ্রেক্ষিত: শাহজাদা দারাশুকো

"আস্‌সালাতো খয়রুম মিনন্ নওম্—

শব্দ, সুর একই সঙ্গে ভোর রাতের বাতাস কেটে কেটে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এখন রাতের শেষ দিকে আর সেই শীত নেই। ফাল্গুন মাস শুরু হয় হয়। আজানের সুরের ভেতর শেরগির হাতিদের কেউ কেউ দিন শুরুর আগেই প্রথম গরম নাদ ফেলতে শুরু করেছে। তারই মৃদু চেনা শব্দ কাছেরই পিলখানা থেকে।" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ০৯)

"কোথায় আজমির— কোথায় কাশী— আর কোথায়ই বা খুন্তাঘাট। যেখানে যত মানুষ— সেখানে তত কিস্‌সা। নদী, পাহাড়, জঙ্গল দিয়ে— কোনো জায়গা বা রাত দিয়ে এক মানুষের ঘটনার ঘনঘোর আরেক মানুষের ঘনঘটা থেকে আলাদা করে রাখা হয়। নইলে কারও যদি একই সঙ্গে সব দেখার ক্ষমতা থাকতো— তো সে বেবাক দেখে ফেলে থ হয়ে যেতো। আমরা ওভাবে

একসঙ্গে দেখতে পাই না। তাই আলাদা আলাদা করে কাজ ও কারণ সাজাই— আলাদা আলাদা করে পরিণাম ভাবি।" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫২)

''এইভাবেই আগ্রা চলছে। এইভাবেই হিন্দুস্থান চলছে। মরহুম মমতাজমহল মানুষের মুখে মুখে এখন তাজবিবি। উস্তাদ ইশার হাতে তৈরি সমাধিমহল যমুনার দক্ষিণ তীরে একটু একটু করে মাথা তুলছে। বিশ হাজার কারিগর দিনরাত ধরেই খেটেই চলেছে— কোনো থামা নেই। সমাধির নাম এখন লোকের মুখে তাজমহল।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬)

এখানে নিরীক্ষক-কথক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে কাহিনি বর্ণনা করে যান— এক ঐতিহাসিক সময়কালের। সর্বজ্ঞতার ফলে তিনি কাহিনির যে কোনও ভূমিকা বা চরিত্রের ভাবনা দেখতে, জানতে পারেন ও দেখাতে, জানাতে পারেন। যেমন,

''...একটা কটু আনন্দে সফির মনটা ভরে উঠলো। এক একটা মনসবি যেন এক একটা বে-ইনসানি কারবার। অন্যায় আর অত্যাচারের কাল। সে নিজে এই চাকার কাঠি হয়ে পড়েছে এই আট বছরে। এক একসময় মনে হয়— সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবে হেলমন্দের তীরে তাদের গাঁয়ের বসত বাড়িতে। হালে উট জুতে সারা জমিন উল্টে পাল্টে দেবে বসন্তের গোড়ায়।" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৪)

''ভাই আসফ খাঁয়ের একথায় নূরজাহান বেগমের ডান চোখ কেঁপে উঠলো। তিনি মনে মনে বললেন, খানজাহান লোদি তোমার পোষা চর ভাইসাহেব! তিনি আসলে তোমার হয়ে শাহজাদা পরভেজকে নজরবন্দী করে রাখবেন! আমিও তাই চাই ভাই সাহেব।..." (প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৩)

এই সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি আমরা লেখকের 'আলো নেই' (দুটি খণ্ড) উপন্যাসেও দেখতে পাই। এই উপন্যাসেও লেখক এক বিশেষ ঐতিহাসিক কালপর্বকে বর্ণনা করেছেন। কোনও বিশেষ সময়ের কথা যখন বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করতে হবে তখন লেখক নিজেকে সর্বজ্ঞ কথক হিসাবে উপস্থাপিত করেন। তবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সর্বজ্ঞকথনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি বঙ্কিমীয় সামগ্রিক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেননি। সীমিত সর্বজ্ঞ নিরীক্ষণ, কাহিনিতলের অন্তর্গত ভূমিকা বা চরিত্রের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত করা ও চরিত্রদের আখ্যানে নিজের ঘটনাবলী, ভাবনা কিংবা অন্য চরিত্রের কার্যাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে লেখক অধিক স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়াও সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে, যেমন— 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'স্বর্গের আগের স্টেশন', 'চন্দনেশ্বর জংশন','অদ্য শেষ রজনী', 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসে সর্বজ্ঞকথনরীতি ব্যবহার

করেছেন লেখক। 'পরীর সঙ্গে প্রেম' উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমী কায়দায় পাঠককে সম্বোধন করে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন বারবার। যেমন—

''পাঠক আমায় ক্ষমা করুন। এরকম পুরানো কায়দাতেই ওদের দেখা হয়েছিল। তা প্রায় সাত বছর বাদে। এটা বানিয়ে লিখব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখছি— যা ঘটেছিল, হুবহু তা-ই লেখায় চলে আসছে। আমি আটকাতে পারছি না কিছুতেই। তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি, এ কোনো বাল্যপ্রেমের কাহিনি নয়। নির্জলা ঘটনা। আমি ফাঁকে ফোকোরে দর্শন গুঁজে দেওয়ার কোনো চেষ্টা করব না— একথা হলফ করে বলছি।'' (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২২৩)

''পাঠক, বাকিটা আমি সর্বাংশে সুনীলের মতো লিখবার প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমি ওঁর অন্তত কুড়িখানা বই এবং অন্তত দশটি গল্প ছাত্রের মতোই মন দিয়ে পড়েছি। (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২২৩)

'সতী অসতী' উপন্যাসেও লেখক পাঠককে সম্বোধন করে কাহিনি উপস্থাপন করেছেন। উপরিউক্ত দুই রীতি ছাড়াও আমরা লেখককে আত্মকথনরীতি ব্যবহার করতে দেখি কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে। আখ্যানের কথক সর্বদা উত্তম পুরুষ হয়। কথক নিরীক্ষক হতেও পারে বা নাও হতে পারে— তার অবস্থান কাহিনিতলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আবার বাইরেরও হতে পারে। এই নিরীক্ষণ ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কথনরীতির উদ্ভব ঘটে। সাধারণত আত্মকথন রীতিতে কোনও একজন কথকের মাধ্যমে সমগ্র আখ্যান বর্ণনা করা এবং অবশ্যই সে কাহিনিতলের অন্তর্গত কোনও মুখ্য বা গৌণ চরিত্র বা ভূমিকা হবে। নয়তো দুই বা তার অধিক কথকের মাধ্যমে ক্রমপর্যায়ে সমগ্র আখ্যান বর্ণনা করা হয় কিংবা গৌণ চরিত্র বা ভূমিকার কথনে অন্য চরিত্রের আত্মকথন ব্যবহার করে আখ্যান বর্ণনা করা হয়। আত্মকথন পরিস্থিতির একক ও যৌগিক উভয় প্রকার বিভাগ আমরা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসম্ভারে দেখতে পাই। আত্মকথনরীতি দেখা যায়, 'পরস্ত্রী', 'ফিরোজা', 'সিদ্ধকামিনী', 'সুধাময়ীর দিনলিপি' উপন্যাসগুলোতে। এছাড়া মিশ্রকথনরীতি দেখা যায়, 'একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে আমরা আত্মকথন, ভূমিকানুগ কথন ও সর্বজ্ঞকথন— এই তিন রীতির মিশ্রণ দেখতে পাই। তাই এটি মিশ্রকথনরীতির একটি উদাহরণ। লেখকের আত্মকথনরীতির উপন্যাসগুলোতে মুখ্যচরিত্রই কথকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তবে সর্বদা কথক নিজের নিরীক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের নিরীক্ষণ ব্যবহার করেছে। ফলে আত্মকথন রীতিতে কথকের নিরীক্ষণের যে সীমাবদ্ধতা থাকে— তা ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা দূরীভূত হয়েছে। 'পরস্ত্রী' উপন্যাসে আত্মকথনরীতির কিছু বৈচিত্র্য তুলে ধরা হলো। জগদীশ রায়ের আত্মকথনে

লেখক তার ভাবনা বিবৃত করছে— ''চল্লিশের কাছাকাছি জগদীশ রায় এভাবে ভাবে। সে আরও অনেক কিছু ভাবে। গরুর গলকম্বলে সামান্য মারবেলের মালা কি সুন্দর শোভা পায়। অথচ দেবীর গলায় ছোট্ট ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে যাকে বলে গোধূলি নাগাদ যদি ওকে নীলাম্বরী পরিয়ে যে কোনও মাঠ দিয়ে হাঁটিয়ে আনা যায়, তাহলে সেই সব ভাব কি মনে উদয় হবে— যেমন, বাৎসল্য, বনদেবীকা, দীঘির গায়ে ঝাঁকড়া আশফল গাছের ছায়া।'' (পরস্ত্রী, পৃ. ৯৬)

আবার 'ফিরোজা' উপন্যাসে একক কথকের নিরীক্ষণ ও কথন ব্যতিরেকে অন্য এক চরিত্রের (হাসান আজিজুল হক) নিরীক্ষণ ও কথন ব্যবহার করা এভাবে—

''দর্শনের অধ্যাপক— অরিজিন্যাল বর্ধমানের লোক, এই হাসান আজিজুল হক মানুষটি যেমন পণ্ডিত— তেমনি সুরসিক। ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার এমনি হাসতে হাসতে বলছিলেন।'' (ফিরোজা, পৃ. ১৯০)

অনুরূপভাবে 'সিদ্ধকামিনী' উপন্যাসে কথক পার্থসারথী দত্তগুপ্ত খোকন চরিত্রের নিরীক্ষণ ও কথন ব্যবহার করেছেন। আসলে আত্মকথনরীতিতে আখ্যান বিবৃত করলে মাঝে মাঝে একঘেয়ামি বর্ণন হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে— তা দূরীভূত করার জন্যই লেখক আত্মকথনরীতিতে এই ধরনের বিভিন্ন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। তিন প্রকার কথনরীতিতেই যে লেখক সিদ্ধহস্ত, তা উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত। উত্তম পুরুষের মধ্যে কখনও কখনও লেখকের অনুপ্রবেশ বা কথক 'আমি' ও লেখক 'আমি' এক হয়ে গেছে এবং তার মধ্য দিয়ে লেখক-স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। উত্তম পুরুষ থেকে প্রথম পুরুষের যাতায়াত পথ করেছেন মসৃণ। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাহিনি বর্ণনায় উত্তম পুরুষের বর্ণনা-কৌশলে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বলেই কোনও উপন্যাসেরই কাহিনি পাঠ আমাদের কাছে বিরক্তিকর, শ্লথ, বন্ধুর, আস্বাচ্ছদ্যকর মনে হয় না।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি উপস্থাপনের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, প্রায় কোনোরূপ ভূমিকা বা আবহ তৈরি না করেই লেখক সরাসরি মূল কাহিনিতে প্রবেশ করেন। কাহিনির প্রধান চরিত্রের ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেখকের কাহিনি বর্ণন শুরু হয়ে যায়। যেমন—

ক. ''বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে সিনেমা হলে এসে উঠল প্রমথ।'' ('অর্জুনের অজ্ঞাতবাস'/সূচনাবাক্য)

খ. ''বাঁ হাতখানা মেলে ধরলো কুবের।'' ('কুবেরের বিষয় আশয়'/সূচনা বাক্য)

গ. ''হাওড়া ব্রিজের মুখে এসে জ্যাম। চন্দ্রকান্ত আর পরশুরাম বাস থেকে নেমেই দৌড়তে লাগল।'' ('স্বর্গে তিন পাপী'/সূচনাকালীন প্রথম দুই বাক্য)

ঘ. ''রবিবার ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। জানলা দিয়ে চেনা আমগাছটাকে দেখল দেবুবাবু।'' ('হিম পড়ে গেল'/সূচনাকালীন প্রথম দুই বাক্য)

ঙ. ''প্রথম তিন সিন অমিয় দর্শকদের দিকে তাকাতে সময় পায়নি।'' (অদ্য শেষ রজনী/ সূচনা বাক্য)

চ. ''ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন বাজারের মুখে অক্রুরবাবুর সঙ্গে দেখা হল অনাথের।'' ('ঈশ্বরীতলার রূপোকথা'/সূচনাবাক্য)

ছ. ''ডাক্তারবাবুর কাছাকাছি যখন পৌঁছাল ভক্তি— তখন চেম্বারের ওয়ালক্লকে বেলা সাড়ে এগারোটা।'' ('আবিষ্কার'/সূচনাবাক্য)

জ. ''বৃষ্টি নামার মুখে শেখর মিনিবাস পেয়ে গেল।'' ('পরীর সঙ্গে প্রেম'/সূচনা বাক্য)

ঝ. ''রাধা বলল, ওভাবে আমায় ধরো না।'' ('একদা ঘাতক'/সূচনাবাক্য)

ঞ. ''কাকের ডাকে ঘুম ভাঙল সুশান্তর।'' ('শেষ বিকেলের আলো'/সূচনা বাক্য)

ট. ''আপনার স্ত্রী আপনার বন্ধু নন।'' ('বাম অলিন্দ'/সূচনা বাক্য)

ঠ. ''কেমন আছ?'' ('অদৃশ্য ভূমিকম্প'/সূচনা বাক্য)

ড. ''ওজন যন্ত্রে ওঠার আগে প্রণবেশ দস্তিদার পায়ের পাম্পসু খুলে নিল।'' (কঠিন সময়/ সূচনা বাক্য)

এছাড়াও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে কাহিনি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বাক্য ধ্রুবপদের মত ব্যবহার করেন। এটা লেখকের নিজস্ব স্টাইল বলা যেতে পারে। যেমন—

ক. ''আমার চোখে একরকমের মহিষের কাজল আছে। খুব অন্ধকার সেই কাজল। আঁসটে গন্ধ সে কাজলে— আমার চোখ লাল হয়— আমি যা দেখি তা লালচে। দেখেই ফুলে উঠি।''

('অর্জুনের অজ্ঞাতবাস'/পৃ. ৫৪)

খ. ''মনে রাখতে হবে এই ভদ্রমহিলার বাবা ব্লাডপ্রেসার, লোভ, ব্যাবসায় বুদ্ধি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, উচ্চাশা এবং অতিরিক্ত কামে ভুগতেন। আর তিনি মরার বছর দশেক আগে থেকেই অর্শ আর ভগন্দরে বড় বেগ পান।'' (অনিলের পুতুল/পৃ. ১৯৩)

গ. ''একটা স্যাড ঘটনায়— এক্সপিরিয়েন্স বলতে পার—'' ('কুবেরের বিষয় আশয়'/পৃ. ৪০৫)

গ. ভাষা বিন্যাস:

উপন্যাস তথা যে কোনও কথাশিল্পের ক্ষেত্রেই ভাষাবিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ ভাষার মাধ্যমেই কাহিনি বিবৃত হয়। আর প্রতিটি প্রথম শ্রেণির লেখকের ভাষাচর্চার মাধ্যমে নিজস্ব একটি ভাষাশৈলী তৈরি হয়। যে ভাষাশৈলী লিখন- শৈলীর অন্তর্গত এবং যেখানে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও শব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে ভাষা নির্মাণের কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়। তাই ভাব প্রকাশের উপায় বা কৌশল হিসাবে ভাষাবিন্যাসরীতি গুরুত্ব সহকারে আলোচনাযোগ্য। কাহিনরি গতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ, বিভিন্ন ধরনের সংলাপ, চরিত্রচিত্রণ, প্রতীক-চিত্রকল্প-কল্পচিত্র, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য প্রকাশ, না-বলা কথা, বিষয় অনুযায়ী ভাষাশৈলী ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কোনও লেখকের ভাষাবিন্যাসরীতি বিশ্লেষণ করতে পারি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং নিজের ভাষাবিন্যাসরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, ''লেখার উদ্দেশ্যে একটিই। তা হল উন্মোচন। অনুসন্ধানের পথে পথে এই উন্মোচন। বিনা মন্তব্যে সরল বাক্য সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার পদ্ধতি। আমি বলতে চাই সবচেয়ে কম। আর চাই— আমার না— বলাটুকু পাঠকের মনে ক্রমিক পুনঃসৃষ্টি হতে থাকুক। সে-ই পথ খুঁজে পাক। তাই সাধারণত আমার কোন রচনাতেই জটিল বাক্য থাকে না। কেউ বলেন— বড় কাটা-কাটা লাগে। আমি এটা ইচ্ছে করেই করি! কেননা এটাই আমার পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতে আমি টেবিল, চেয়ারের মতোই অনায়াসে উপযুক্ত ইংরাজি কথা ব্যবহার করি। কারণ জানি এই কথাগুলি আমরা অন্য সময়ে বাংলার মতোই আমাদের বাক্যে ব্যবহার করে থাকি। নজর রাখি একটা হেভি শব্দের বদলে যেন আটপৌরে শব্দ খুঁজে পাই।''[১৫] লেখকের এই ধরনের মানসপ্রবণতা অনুসারে লেখকবিশেষে ভাষাবিন্যাসরীতি বদলে যায়। আর কথাশিল্পে ব্যাকরণশুদ্ধ প্রচলিত ভাষা ব্যবহার অপেক্ষাকৃত দুর্বল কল্পনা ও প্রতিভার পরিচয় বহন করে। কারণ সৃজনশীল ও মননশীল লেখকেরা ভাষাকে নিজেদের মতো নির্মাণ ও ব্যবহার করেন। যার ফলে কোনো লেখকের নাম অজ্ঞাত রেখে তার কোনও রচনা কোনও সহৃদয়হৃদয়সংবাদী পাঠক পাঠ করলেই বুঝতে পারে, এটা কোন্ লেখকের রচনা। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সেই জাতের ভাষাশিল্পী, সেই জাতের লেখক। যিনি নিজস্ব ভাষাশৈলী নির্মাণে সফল হয়েছেন 'অনায়াস ভঙ্গীতে'। আমরা নির্বাচিত কিছু উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অবলম্বনে লেখকের ভাষাবিন্যাসরীতি আলোচনা করব।

'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে প্রথম-সুধার সম্পর্কের আবহাওয়া বোঝানোর জন্য লেখক প্রমথ-সুধার প্রথম সাক্ষাতে (উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে) ইঙ্গিতবাহী বাক্যের ব্যবহার, (কাহিনির

সূচনালগ্নে) ''হঠাৎ এক সময় খারাপ চালের বিটকেল গন্ধ চারিয়ে গেল সারাঘরে।'' (পৃ. ২৮) এই 'খারাপ চালের বিটকেল গন্ধ'ই বেঁচে ছিল প্রমথ-সুধার ভালোবাসার সম্পর্কে। অবিনাশদার বর্তমান অবস্থা বোঝানোর জন্য দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত জিনিসের উপমা দিয়ে বর্ণনা, ''স্তাবকতার রসে মজে অবিনাশদা এখন রসস্থ লেবু— মানে পচা লেবু।'' (পৃ. ৮২)

চিত্রকল্প :

ক. ''গাড়িটা চোখ বুজে আরামে তেল খাচ্ছে— সৎ হচ্ছে।'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ১২২)

খ. ''বিকেলটাকে খেয়ে ফেলে সন্ধে একদম ঝুলবারান্দায় উঠে এল।'' (পরবর্তী আকর্ষণ, পৃ. ৩৬৮)

গ. ''ভয়ংকর শীতে চাঁদ পর্যন্ত খানিক মেঘ চাপালো গায়ে।'' (হাওয়াগাড়ি , ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯)

ঘ. ''চাঁদের আউটলাইনটা ছিল আকাশে। ভেতরের হলুদ মুছে গেছে। কেননা সূর্য সমুদ্রের এক জায়গা থেকে উঠবে বলে তৈরি হচ্ছিল। খোরধার পাহাড়ও কোণে দক্ষিণের আকাশ জুড়ে জেগে উঠল।'' (স্বর্গে তিন পাপী, পৃ. ২৭০)

ঙ. ''সামনের পাহাড়ে খানিকটা জায়গা চোকলা উঠে গিয়ে লাল দগদগে একটা চেহেরা রোদে বেরিয়ে আছে।'' (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২৬০)

ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ:

ক. ''দেখুন ছোটবেলায় খুব একটা ট্র্যাজিক', একটু থামতেই হলো কুবেরকে, এত ভিড়ে কিছু বলা যায় না, 'স্যাড্ এক্সপিরিয়েন্স ঘটনা বলতে পারেন—'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ২৮৩)

খ. ''তার ভেতরেই নতুন জুতো থেকে বেদিং সোপ—রুম হিটার থেকে ফ্রিজিডিয়ার— যে কোনো কনজিউমার গুডস সারা ইণ্ডিয়া জুড়ে ক্যাম্পেন করে দিব্যি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। এর নাম ভাইটালিটি। সঠিক ছবির সঙ্গে সঠিক স্লোগান।'' (অদৃশ্য ভূমিকম্প, পৃ. ৫২০)

গ. ''আমি আবার ভবার বাচ্চাদের এডুকেশনে মন দিচ্ছিলাম! ভবাকে করতে গেলাম কম্বাইণ্ড হ্যান্ড।'' (বাম অলিন্দ, পৃ. ৫১১)

কুবেরের বিষয় আশায়: আটপৌরে শব্দ প্রয়োগ:

ক. 'বলরাম, ভুবন ওরা বড় ভোগা দিচ্ছে।'' (পৃ. ২৮৬)

খ. ''কবে! কিন্তু, মাইরি বউটাই আঁটকুড়ো—'' (পৃ. ৩১৩)

গ. ''ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা দুই সারি তালগাছের ফাঁকে আকাশের সরু মত গলিটা ধরে চাঁদ একেবারে কদমপুরের মাথার ওপর নেমে এসেছে—'' (পৃ. ৩২২)

ঘ. ''গণেশ কারও চুংলি চাপটি করে না।'' (পৃ. ৪০৯)

আটপৌরে শব্দ প্রয়োগ: অন্যান্য উপন্যাসে:

খ. 'ভাতার' (স্বর্গের আগের স্টেশন), 'প্যালা' (যতীন দারোগার বেদান্ত), 'টরটরি' (মহাজীবন), 'আকচা-আকচি' (সিদ্ধকামিনী), 'আশানাই' (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল), 'ধামসায়' (গত জন্মের রাস্তায়), 'সিড়িঙ্গে' (বড় হওয়ার আগে)।

কুবেরের বিষয় আশায়: মিথ-পুরাণ প্রসঙ্গের ব্যবহার:

ক. ''লক্ষ্মী চঞ্চলা! বাবা যত্ন নেননি। আটবারের বার লক্ষ্মী আর এলেন না।'' (পৃ. ৩৩৪)

খ. ''শেষে যেদিন টান পড়ল— অগস্ত্য চুমুকে সমুদ্র শেষ।'' (পৃ. ৩৫৩-৫৪)

মিথ-পুরাণ প্রসঙ্গের ব্যবহার: অন্যান্য উপন্যাসে:

ক. ''এক এক সময় মেঘ মহাভারতের কৌরব সেনা হয়ে আসে। আবার রামায়ণের গল্পের চেহেরাও নেয়।'' (ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ৭৯)

খ. ''মনে হবে নোয়ার জাহাজের কলঘরে বেলচায় করে কয়লা দেওয়া আরম্ভ করেছিলাম, যেন এখনও দিচ্ছি— শেষ হবে না। কোনো দিন শেষ হবে না।'' (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, পৃ. ৮৩)

গ. ''তিনি বলেন, এখন তো যজ্ঞ মানে একটা প্রাণহীন ব্যাপার। কিন্তু যজুর্বেদের আমলে ব্যাপারটা ছিল সবাই নিয়ে আনন্দের। এখন যেমন পুজো-পার্বণ— সেইরকম তখন ছিল যজ্ঞ। যজুর কালে কয়েকদিন ধরে গ্রাম-গ্রামান্তরের বাসিন্দাদের ঢালাও খাওয়া দাওয়া-পানভোজনের নামই ছিল যজ্ঞ।'' (কামিনীকাঞ্চন, পৃ. ১৬৫)

কুবেরের বিষয় আশয়: প্রতীক:

''তখন হলদের বদলে নীলচে মাখন মাখানো চাঁদ দেখে খুব মুশকিলে পড়েছিল আভা।'' (পৃ. ৪৮৮)

''মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা রেখে কুবের চাঁদ পেয়ে গেল।'' (পৃ. ৪৯৮)

এছাড়া 'সাপ' (কদমপুরের সাপ ও মেদনমল্ল দ্বীপের সাপ) প্রতীক হিসাবে উপন্যাসে উঠে এসেছে।

প্রতীক: অন্যান্য উপন্যাসে:

মহিষ, মহিষের আঁসটে গন্ধযুক্ত কাজল (অর্জুনের অজ্ঞাতবাস), ময়ূর (অনিলের পুতুল), বুনো পরগাছা ফুল (সতী অসতী), হরিণ শিশু (হাওয়াগাড়ি)।

সাহিত্য প্রকরণ অনুসারে যাকে আমরা 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বলি— সেই অর্থে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কোনও আঞ্চলিক উপন্যাস লেখেননি। তবে আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে লেখকের বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় লাভ করতে পারি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস থেকে। আসলে লেখক বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে শুধু মেশেননি, ভাষা-সংস্কৃতিসহ গোটা মানুষকে ঔপন্যাসিক-বীক্ষায় বীক্ষণ করেছেন। তাই চরিত্রের সংলাপ রচনায় কৃত্রিমতা বর্জিত স্বতঃস্ফূর্ত আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করতে পেরেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হলো—

ক. ''বাড়ি ঢুকতেই বজরা চেঁচিয়ে উঠল, মরা কুকুর জ্যাতা করার ভার নিতি গেলি কেন?'' (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ২৬)

খ. ''সাইঝে বাবুরে ডাকেন না কেন একবার। এই তো আমার ধর্মপত্নী—সনকা নস্কর। ঈশাদি সাক্ষীর টিপছাপ সনকা দেবেনে।'' (চন্দনেশ্বর জংশন, পৃ. ২০৮)

গ. ''নেহি বাবুজি। মেরি ভালাই মেরি হাতপে ছোড়িয়ে। ম্যায় ইহা নেহি রহেগি। এ মেরি জগ্‌হা নেহি। চলে চলো— কোই জবরদস্তি মেরি বিলকুল বে-পসন্দ।'' (মহাজীবন, পৃ. ১৩৭)

ঘ. ''তারপর ভানুকে দেখে এগিয়ে আসে, আরে! তুঝে তো ভানুয়া যয়সন লাগতা— আরে ভানুয়াই হো! কা বটে— '' (যতীন দারোগার বেদান্ত, পৃ. ৯২)

জটিল বাক্য ব্যবহার না করে কাটা-কাটা বাক্যে রিপোর্ট করার ভঙ্গিতে বর্ণনা:

ক. ''রোজ একটু একটু করে গ্রাম মুছে যাচ্ছে। ইলেট্রিক ট্রেনে হাওড়া সওয়া ঘন্টা। টেলিফোনে পলকে কলকাতা। টিভি-তে রাজ্জাক, শাহরুখ খান, ঋতুপর্ণা। রান্না এড়াতে ভাতের হোটেলে এক টাকা দামের ডালডায় ভাজা মোটা পরোটার নাস্তা। চোখের সামনে নদী দিয়ে রাজার মতো জাহাজ যায় আসে। বাঙলা খবরে বিনলাদেন, ক্লিন্টন, বাজপাই। সবাই সব জানে। অথচ এসব জায়গা না-শহর-না গ্রাম। এখন দোআসলা জগতে কিছুই সিওর নয়। খুন হয়। রেপ হয়। ভালোবাসা হয়। লোভ হয়। দুঃখ হয়। আনন্দ হয়।'' (গঙ্গা একটি নদীর নাম, পৃ. ১২)

খ. ''বিরাট তেতলা বাড়ি। একেবারে মির্জাপুর স্ট্রিটের ওপর। লম্বাটে। একটু এগোলেই শিয়ালদা। বাড়িটার আশেপাশে কাটা কাগজ, বাঁধাইয়ের দোকান। বাড়িটার গায়ে দোকান। বাড়িটার

গায়ে দোতলায় বড় একটা সাইনবোর্ড। টিনের। তার সাদা জমির ওপর বাংলা হরফে লেখা প্যারাডাইস লজ। তার নীচে লেখা ৪১ নং মির্জাপুর স্ট্রিট।" (আলো নেই, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩)

গ. ''গোকুল দত্ত। বয়স সাতান্ন। দাবি করেন একান্ন। দশাসই শরীর। সেলফ-মেড মানুষ। কলকাতার বুকে তিনটি মোষের খাটাল আছে। দুটি স্ত্রী। একটি অফিসিয়াল। অন্যটি বেআইনী। কিন্তু পুরোপুরি বউয়ের মর্যাদা তিনি তাকে দিয়েছেন। গোকুল দিলদার লোক।" (হাওয়াগাড়ি, পৃ. ২৬)

ঘ. ''প্রধানমন্ত্রী খানিকক্ষণ দেখবেন বলে এসেছিলেন। কাজের চাপ। কিন্তু উঠতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বসে দেখলেন। অভিনয়ের পর সুবীর আর রজনী ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল। রজনী একটু ঝুঁকে নমস্কার করল। সুবীরও তাই। প্রধানমন্ত্রী হাসলেন। হাসিমুখে রজনীর হাত একটু ধরলেন। কী যেন বললেন। অমিয় প্রায় ছ'টা রো পেছন থেকে তার কিছুই শুনতে পেল না।" (অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ১৮৭)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছেন চরিত্র অনুযায়ী। নীচে দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

ক. নগর কলকাতার রকবাজ ছেলেদের বাক্যে সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ: ক্যালি (যোগ্যতা অর্থে), ঘ্যাম্ (যে টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে), পুরু (যার আর কিছু হবে না), বং (যাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না), ড্রেন ফেটে যাওয়া (ভাগ্য খারাপ হওয়া), কাই (কিপ্‌টে), ব্যাংচাপটা (থেতলে যাওয়া), মহা হরফন পার্টি (অতিচালাক লোক), গজ (তৎকালীন সময়ে গজ আঁকা একশো টাকার নোট) টাল্টু (ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে যে), ['অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে সন্তু ব্যবহৃত শব্দ] খোমা (মুখের চেহেরা) ['হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে টাপু ব্যবহৃত শব্দ]।

খ. সমাজবিরোধী মস্তানদের বাক্যে সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ: মামলেট (মিথ্যে কথা), টোস্ট (ন্যাকামি), প্যালা (ঘুষ বা বখশিস)। ('যতীন দারোগার বেদান্ত' উপন্যাসে ভানু ব্যবহৃতশব্দ)।

গ. তন্ত্রসাধানায় ব্যবহৃত শব্দ: i. আমার ঝোলা থেকে খানিকটা খ-পুষ্প খেয়ে নে। তারপর তোর কপালে আমি ব-পুষ্পের তেলক টেনে দিচ্ছি। (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ৩৮)

ii. ''বাবা সাধারণ শ্মশানকেই এখন ক্ষ্যাপানাথতলা, সর্বনাশী ঘাট, বগলাবাহী গঙ্গা, পঞ্চমুণ্ডির মোড়— নিজের মনের ছবির মত করে খনিকক্ষণের জন্যে বানিয়ে নিতেন।" (সিদ্ধকামিনী, পৃ. ২৮)

অলঙ্কারের ব্যবহার:

ক. ''চোখে যেটুকু ঘুম ছিল ফলের খোসা তোলার মতো তা একদম উঠে গেল।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ২২৩)

খ. ''অনিল ফ্যাকাসে ভেড়ার মতো মুখ তুলল।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ২৪৮)

গ. ''আসলে নীলকান্ত এই সেফটিন গাঁথা নিশ্চিত জীবনটুকু ষোলো আনাই চেটে চুষে খেতে চায়।'' (সরমা ও নীলকান্ত, পৃ. ১২)

ঘ. ''এখন এই মুহূর্তে সে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো ভালোবাসা ট্রান্সফার করতে পারে।'' (সরমা ও নীলকান্ত, পৃ. ৪৫)

ঙ. ''শেষ রাতের হেলে-পড়া চাঁদখানা বাওড়ের জলে একখানা কাঁসার থালা হয়ে ভাসছিলো।'' (ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ৫৫)

চ. ''আমসত্ত্বের স্লাবের মতো জমানো দুঃখ এখনো পিস হিসাবে বাজারে বেরোয়নি।'' (পরীর সঙ্গে প্রেম, পৃ. ২৫৫)

ছ. ''আসলে ওর কাছে নাকি এই পৃথিবীটাই বাসি আটার রুটি।'' (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ৬৬)

জ. ''পুরুষের সোহাগ! সে তো জোনাকির আলো।'' (চন্দনের জংশন, পৃ. ১৬৪)

ঝ. ''সাবানের ফেনার মত দলা দলা কুয়াশা ঝুলে পড়েছে রাস্তার ওপর। (মহাজীবন, পৃ. ১০)

ঞ. ''তার মাথার খোঁপা খুলে গিয়ে পেছন দিকে কালো বন্যা হয়ে উড়তে লাগল।'' (এক সিংহ ও তার রমণী, পৃ. ৯৫)

ট. ''এখন বয়সটাই কেন্নোর মত লেগে আছে।'' (তারসানাই, পৃ. ৯)

প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার:

ক. ''নগেন্দ্রর অবস্থা বলতে গিয়ে সেজো বলত, 'নগেন্দ্রবাবুর যখন বিয়ে হয় তখন তিনি ক্লাস টেনে পড়েন। চালে হাগলে পাতে পড়ে।'' (অনিলের পুতুল, পৃ. ২১১)

খ. ''পুরুষলোক আমি জানি। অত ধোয়া তুলসিপাতা নয়।'' (স্বর্গের আগের স্টেশন, পৃ. ৮৯)

গ. ''আমি ঘরপোড়া গরু। আমি সিঁদুর দেখলেই চমকে উঠি।'' (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল,

পৃ. ১০৫)

ঘ. ''সবদিকেই বড় তুমি সাধনা। বড়র ভালবাসা তাই বালির বাঁধ।'' (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল, পৃ. ১৩০)

বর্ণনা (মানুষ ও মেশিনের একীভবন) :

ক. ''মেশিনটা খুব ভালো। ঘুমন্ত অবস্থাতেও কত জোরে তাকে জড়িয়ে আছে। ভেতরের কলকব্জায় ক্লান্ত পিস্টনগুলো ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাস পাঠাচ্ছিল বাইরে। বহুকাল পরে অমিয়কে এ অবস্থায় পেয়ে লীলা তাকে রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না।'' (অদ্য শেষ রজনী, পৃ. ২২৬)

খ. ''কুবেরের প্রায়ই ইচ্ছা হয় তার সারাটা শরীর যদি কোন সাইকেল সারানোর দোকানে আগাগোড়া খুলে ফেলে ডবল চেনে সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারত— তাহলে জয়েন্টে জয়েন্টে তেল ঢেলে ঘষে মেজে নিত। বলা তো যায় না, এত দিনের মেশিন— কোথায় কী হয়ে আছে।'' (কুবেরের বিষয় আশয়, পৃ. ৩০০)

গ. ''কিন্তু ইচ্ অ্যাণ্ড এভরি বাতিল মোটরকারের ইঞ্জিনের জন্য আমার দুঃখ হয়। আহা! ওরা আরও অনেক দিন কাজ করতে পারত। কিন্তু বডি ব্যাটারি— বিট্রে করেছে। তাই এ অবস্থা। স্ক্র্যাপ হয়ে মল্লিকবাজারে চলে যাবে। আহা রে!'' (হাওয়াগাড়ি, পৃ. ১০০)

স্বগতোক্তি:

''দিলীপের মনের ভেতর এখন একই সঙ্গে পর পর তিনটে সেন্টেন্স একদম ডায়ালগের স্টাইলে পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়ালো।

তুই ঋষি এ-র‍্যাকেটের ভেতর কি করে আছিস?

আমাকে বাদ দিয়ে তোর অন্য লোকের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে?

আমাকে দেখে কোলইণ্ডিয়ার জন্যে তোর ভেতর কোন ধিক্কার ওঠে না?

কিন্তু কোনোটাই বলা যায় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কথাগুলো বলতেই মানুষের গলা বুঁজে আসে। কথা চোক করে।'' (হাওয়াগাড়ি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০২)

বিশেষ ভঙ্গিতে বাক্যগঠন:

''যেদিন মাঝরাতে জেগে উঠেছে বীরেন— সেদিনই এই খুট খাট। কিংবা এই খুটখাট তাকে জাগিয়ে। একদিন তো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায়। দাঁত বসাচ্ছিল। জেগে গিয়ে বীরেন

কোন ডিসটার্ব করেনি। চুপ করে অপেক্ষা। বেড সুইচ টিপে সে আস্তে রাধাকে। ওঠো। বোধ হয় সাপে—।" (এক গেরস্থের তিন সংশয়, পৃ. ৯১)

বাক্যে 'য়'-এর লোপ: ''মাদের সব বোনেরই অসাধারণ চেষ্টা— বড় হতেই হবে।" (অনিলের পুতুল, পৃ. ২১০)

বর্ণনা (গঙ্গা তীরবর্তী পরিপার্শ্ব) :

''গঙ্গার জন্যেই কলকাতার রাজধানীতে প্রোমোশন। গঙ্গার জন্যেই পাটকল। চাঁদ মহম্মদ মল্লিকের মতো লোকজনের মডার্ণ হোসিয়ারি ফ্যাক্টরি। কলকাতাকে ঘিরে— গঙ্গাকে ছুঁয়ে— বা তার সাঙ্গোপাঙ্গো খুচরো নদীগুলোর বুক ব্রিজ দিয়ে টপকে রেল লাইন— স্টেশন, বাজার, মানুষজন, মামলা, আদালত। কলকাতাকে ঘিরে—গঙ্গাকে কোনো না কোনোভাবে ছুঁয়ে পঞ্চাশ ষাট মাইল জুড়ে এমন জমজমাট হাসি কান্না, ঝগড়াঝাটি, ভালবাসার ভেতর গাদাগাদি করে দু-তিন কোটি মানুষ মহামজায়— মহাদুঃখে— মহাআহ্লাদে কাজকর্ম করছে— ঘুমোচ্ছে খাচ্ছে দাচ্ছে— অসুখে ভুগছে— নামাজ পড়ছে, ঠাকুর ভাসান দিচ্ছে— ভোট দিচ্ছে— গোহাটায় হালের বলদ কিনছে— তাঁত বুনছে— ট্রানজিস্টারে গান, খবর সব শুনে যাচ্ছে— খবরের কাগজ পেলেও পড়ে ফেলছে— শীতে ধানকাটা মাঠে যাত্রা শুনছে।" (গঙ্গা একটি নদীর নাম, পৃ. ১২)

বর্ণনা (পাহাড়-জঙ্গল-ঝড়):

''আমরা রাতে শুয়ে পড়ার পর উসলাপুঞ্জা পাহাড় থেকে বাতাস নেমে এসে ঝড় হয়ে যেতো। উতয়, তেল, শ্যান্ডেল নদীর জল সেই ঝড়ে তির তির করে কাঁপতো নিশ্চয়। কুসুমখাল জঙ্গল, বড়ডঙ্গরের জঙ্গল— তাদের সব গাছাপালা নিয়ে এলোপাথাড়ি দুলতো। মহুয়া, কেন্দু, গামা, লোহাগাছ— সব পাগলের মত মাথা দোলাতো। বিছানায় শুয়ে আমরা ঝড়ের সেই সোঁ সোঁ শব্দের ভেতর ময়ূরের বাচ্চার কান্না শুনতাম।

এ এক আশ্চর্য ঝড়। তখন সারা জঙ্গলের লতা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ফুল ঝরে পড়ছে। পাকা কেন্দুফল খসে পড়ে গাছতলা ঢেকে ফেলছে। মহুয়া ফুলগুলো বোঁটা খসে অন্ধকার বাতাসে কে কোনদিকে উড়ে যাচ্ছে।" (সুধাময়ীর দিনলিপি, পৃ. ২৪)

বর্ণনা (চরিত্র):

''ভেতরে পেল্লাই এক হর্স সু টেবিলের একদম সেন্টারে দশাসই কুসুমসিন্ধু বসে। নাভি থেকে মাথা অব্দি লোকটা তিন ফুটের বেশি হবে। পা থেকে মাথা অব্দি ধরলে সওয়া ছ ফুট লম্বা।

বছর পঁয়ষট্টি বয়স। দেখলে বোঝার উপায় নেই। এখনও দিনে তিনশো বৈঠক আর তিনশো বুকডন দিয়ে থাকেন কুসুমসিন্ধু। তাই তো শুনেছে হৃষিকেশ। রীতিমত পেটানো শরীর। খদ্দরের কলার তোলা পাঞ্জাবি। নিচে চাপা পাজামা।" (নয়ন, পৃ. ৭৭)

বর্ণনা (ঘটনা):

''তখনো প্রবীর আলোয়ানের প্যাঁচে কুন্দনলালের গলাটা পেঁচিয়ে সরু করে রেখেছে। পড়ে যাওয়া কুন্দনলালের শরীরের ওপরেই প্রবীর বসে থাকল। নড়লো না। পা থেকে পাম্পসু খুলে পড়ল রাস্তার ওপরেই। কুন্দনলালের বাঁ হাত নখসুদ্ধ প্রবীরের ডান কাঁধের শার্টের ওপর চেপে বসে গেছে। অন্ধকারে বুন্দনলালের মুখ দেখতে পেল না। কতক্ষণ সে বুঝতে পারল না— তবে দেখলো ধুতি থেকে বেরিয়ে পড়া দু'খানা পা থিরথির করে কেঁপে থেমে গেল।" (কাপতেনগঞ্জের কুন্দনলাল, পৃ. ১৪০)

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৪৮, পৃ. ৩৪৭

২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'জীবন রহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৫

৩. মান্না গুণময়, 'বাঙলা উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক', ভাষা ও সাহিত্য, ১০/১২ রমানাথ স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১০০

৪. তদেব, পৃ. ১০০

৫. দাস অমিতাভ, 'আখ্যানতত্ত্ব', ঈন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১০, পৃ. ৩৮

৬. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল 'জীবনরহস্য' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮০

৭. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই পৃ. ৪৪৮

৮. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'দশ লক্ষ বছর আগে', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৬৪

৯. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল 'জীবনরহস্য' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২১৩

১০. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'অনিলের পুতুল, রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ২০১১, পৃ. ২১৮

১১. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৪৯০

১২. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল, 'হিম পড়ে গেল', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ২০১১, পৃ. ২৮৫

১৩. দাস অমিতাভ, 'আখ্যানতত্ত্ব', ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স, পৃ. ২৮।

১৪. তদেব, পৃ. ৭৬

১৫. গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল 'জীবনরহস্য' মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৮৪